দম্পতী-সুহৃদ

ও

অবসর কুসুম।

শ্রীরামচন্দ্র মিত্র

প্রণীত।

১ম সংস্করণ।

১৩৩৩ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা, ১৮ নং রামবাগান ষ্ট্রীট হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা, ২৫২ নং অপার সারকুলার রোড
সৌদামিনী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীভোলানাথ মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ওঁ নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ।

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

গুরুদেব,

আপনার অপার মহিমাবলে অন্ধকে চক্ষুস্মান করিয়াছেন। মুকৃকে বাচাল করিয়াছেন। অজ্ঞানকে জ্ঞানরশ্মি দান করিয়াছেন। এই অলৌকিক দানের পরিবর্ত্তে অধীনের কিছুই দিবার ক্ষমতা নাই। পাঞ্চভৌতিক দেহ কবে পঞ্চভূতে লয় হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা না থাকা বিধায়, দেহে দেহী বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে, আপনার সেই অসীম কৃপার বলে দম্পতী-সুহৃদ নামক গ্রন্থখানি লিখিয়া, আপনার শ্রীচরণ কমলে প্রগাঢ় ভক্তির চিহ্নস্বরূপ উপহার দিলাম। ভরসা করি আপনার কৃপা কটাক্ষে ইহা সাধারণের উপকারে আসিয়া আদরনীয় হইবে!

প্রণত

লেখক।

ভূমিকা।

দম্পতী-সুহৃদ নামক পুস্তকখানি এতদিন পরে জনসমাজে প্রচার করিতে সক্ষম হইলাম। ইহা বৃদ্ধ, যুবা ও স্ত্রীলোক সকলেরই পাঠের উপযোগী করা হইয়াছে। স্বল্প পরিশ্রমে এক স্থানে নানা বিষয় জানিবার বিশেষ সুবিধা করা হইয়াছে। বিষয়গুলি সরল ভাষায় গল্পের আকারে লিখিত হওয়াতে পাঠের রুচিকর ও আনন্দপ্রদ হইয়াছে। কুরুচিপূর্ণ নভেল নাটক পাঠ না করিয়া ইহা পাঠ করিলে যে অনেক বিষয় জানিতে পারা যাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জ্ঞানী মহাত্মারা বলেন যে বহুল সংখ্যায় নরপশু উৎপন্ন হওয়াই হিন্দু জাতির পতনের মূল কারণ, সেই নরপশু উৎপন্ন হওয়া স্থগিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে নরদেবতা উৎপন্ন হইলেই, আবার হিন্দুজাতি প্রাধান্য লাভ করিবে। নরপশু উৎপন্ন হইবার প্রধান কারণ অদিনে অসময়ে স্ত্রীগমন, আর ব্যাধিমতি ও ব্যাধিযুক্ত স্ত্রী পুরুষের মিলনেও হয়। আর শুভদিনে ও শুভক্ষণে স্ত্রী গমন করিলেই সুসন্তান জন্মে। যেমন স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টির জল বংশে পতিত হইলে বংশলোচন উৎপন্ন হয় ইহাও তদ্রূপ। আমাদের মঙ্গলের জন্য মুনিঋষিগণ সুসন্তান উৎপন্ন হইবার বিধিনিষেধগুলি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেইগুলি মানিয়া চলিলেই আমরা নরপশুর পরিবর্ত্তে নর দেবতা উৎপন্ন করিতে পারি, কিন্তু আমরা তাহা করি না বলিয়া নরপশু উৎপন্ন হইয়া সংসারের ও সমাজের অশান্তির কারণ হয়। সকলে শাস্ত্র পাঠ করিতে সময় পান না। আর শাস্ত্রও অনন্ত, সময় পাইলেও কোন্ শাস্ত্রের কোন্ স্থানে তাহা লেখা আছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা সকলের পক্ষে সহজ নয়। বিশেষতঃ যুবাদের পক্ষে ইহা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও হয়। সেইজন্য যুবাদিগের পাঠে আকৃষ্ট করিবার জন্য ২।১টী উপাদেয় ও উপদেশপূর্ণ সত্য ও পৌরাণিক গল্প ও তাহার গূঢ় অর্থ বর্ণনা করিয়া, পরে শাস্ত্রে মুনি ঋষি কথিত সুসন্তান উৎপন্ন করিবার উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়া বিষদ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। নব দম্পতীগণ সেই সকল উপদেশ পালন করিয়া যাহাতে সুসন্তান লাভ করিয়া সুখী হইতে পারেন সেই উদ্দেশে এই পুস্তকখানি লেখা হইয়াছে। বিবাহের সময় পিতা মাতা অথবা বন্ধুবান্ধবগণ এই পুস্তক উপহার দিলে নব দম্পতীর যে বিশেষ উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা বৃদ্ধ, যুবা ও স্ত্রীলোক সকলকে এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অবশেষে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের উপযোগী কয়েকটী ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ও অবসর কুসুম নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সকলের সহজ প্রাপ্য হইবে বলিয়া মূল্য যতদূর কম করা সম্ভব তাহা করা হইয়াছে।

লেখক।

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দম্পতী-সুহৃদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"আসরে সজ্জন সভা আমি অন্ধ গাব কিবা,
গুণহীন ক্ষীণ দীন দাস।
করপুটে এ সঙ্কটে কাতর কিঙ্কর রটে,
উর ঘটে, পূর অভিলাষ॥"

পুণ্যভূমি ভারতভূমির তুল্য দেশ জগতে আর কোথাও নাই, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। যে সকল বিদেশী লোক ভারতে আসিয়া ভারতভূমি দেখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতভূমির ন্যায় দেশ জগতে আর কোথাও নাই। প্রকৃতি দেবী ভারতভূমিকে সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য আর কোথায়ও প্রায় দৃষ্ট হয় না। এইখানে ছয় ঋতু সমান ভাবে বর্ত্তমান, এবং সেই কারণে এখানে নানাজাতীয় বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে এবং সেই সকল লতা বৃক্ষ হইতে নানাপ্রকার সুস্বাদু ফলমূল উৎপন্ন হয়। এই স্থানে নানা প্রকার খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কোন দ্রব্যের জন্যই ভারতবাসীদের কোথায়ও যাইতে হয় না। এইস্থানের লোক সকল অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী। শৌর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞান এবং বিজ্ঞানে তাঁহারা এককালে জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। এক সময়ে এই ভারতবাসী জগতের শিক্ষাদাতা গুরু ছিলেন।

ইয়োরোপ যখন অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, ভারত সেই সময়ে জগৎবক্ষে কোহিনুর স্বরূপ বিরাজ করিত, এবং সেই ভারতরূপ কোহিনুরের জ্ঞান বিজ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ দান করিয়া জগতের লোকের অজ্ঞান তিমির নাশ করিত।

কোহিনুর আর দরিয়ানুর নামীয় দুইটী অমূল্য মাণিক, যাহা এই বিশাল জগতে আর কোথাও পাওয়া যায় না, তাহা এই ভারতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। দরিয়ানুরের কোন সম্বাদ বহুকাল যাবৎ পাওয়া যায় না। দরিয়ানুর পারসিক নাম। দরিয়া অর্থে সমুদ্র, আর নূর অর্থে জ্যোতিঃ, অর্থাৎ সমুদ্রের জ্যোতিঃ। সম্ভবতঃ ইহা সমুদ্রে পাওয়া গিয়াছিল, সেই জন্য এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। কোহিনুরও পারসিক নাম, 'কোঃ' অর্থে পর্ব্বত, আর নুর অর্থে জ্যোতিঃ, অর্থাৎ পর্ব্বতের জ্যোতিঃ। কিন্তু ইংরাজেরা ইহার অর্থ করেন Mountain of Light অর্থাৎ আলোর বা জ্যোতির পর্ব্বত। যাহা হউক এই দুই প্রকার অর্থে বিশেষ কিছু দোষ হয় না। অনেক বহুদর্শী এবং বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই মাণিকটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তভ মণি। ইহা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের ভূষণ ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ইহা তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে দান করিয়াছিলেন। এবং রাজা যুধিষ্টির পর পাণ্ডববংশের রাজাদের নিকটেই ছিল। পাণ্ডব রাজ্যের পতনের পর ইহা গান্ধার (বর্ত্তমান কান্দাহার) রাজ্যে নীত হইয়াছিল এবং তথায় অনেক হস্তান্তর হইবার পর খিলিজি, লোদী, পাঠান এবং মোগল জাতিদিগের হস্তগত হইয়াছিল। অবশেষে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে (এই সময় হইতেই ইহার প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়) নাদির সার হস্তগত হইয়াছিল। তিনিই এই মাণিকটির পারসিক নাম দিয়াছিলেন কোহিনুর। তাহার পর ইহা আফগানিস্থানের আমীরদের হস্তগত হয়। শেষ আমীর সাস্থজা ইহা মহারাজ রণজিৎ সিংকে উপহার দিয়াছিলেন। মহারাজা দলিপ সিং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার সিংহাসন পরিত্যাগ করেন সেই সময় এই কোহিনুর ইংরাজদের হস্তে সমর্পণ করেন। তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী ছিলেন, সেই সময় এই মাণিকটির ওজন ছিল ১৮০০ রতি। ক্রমে ক্রমে ইহাকে কর্ত্তন করিয়া ২৪৬ রতিতে আনা হইয়াছে। ইহা এক্ষণে উপস্থিত সম্রাটের শিরোভূষণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন এই মাণিকটি গোলকন্দের স্বর্ণের খনিতে পাওয়া গিয়াছিল।

আমরা কথায় বলি সাত রাজার ধন এক মাণিক। সেই প্রকার দুইটী মাণিক এই রত্নপূর্ণা ভারত ভূমিতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, আর কোথাও নয়। এই কোহিনূরের একটী আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, ইহা যখন যে জাতির কাছে থাকে সেই জাতিরই কোন ভাগ্যবান লোক ভারতের রাজরাজেশ্বর হন। আর সেই জাতির ধন, ঐশ্বর্য্য, বল, বুদ্ধি এত বৃদ্ধি হয় যে তাহার তুল্য আর কোথাও দেখা যায় না। আবার সেই জাতির অত্যাচার, ব্যভিচার এবং প্রজার উপর পীড়ন বৃদ্ধি হইলেই সেই জাতিকে উৎসন্ন করিয়া আর এক জাতির আশ্রয়ে যায়। তাহার প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায়, যখন ইহা শ্রীকৃষ্ণের অধীনে ছিল তখন যদুবংশের উন্নতি চরম সীমায় উঠিয়াছিল, পরে যখন ইহা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অধীনে ছিল, তখন তাঁহার রাজ্যে ধন, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য এবং জ্ঞান চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। কালক্রমে পাণ্ডু রাজাদের সুখরবি অস্তমিত হইলে পর বিদেশীয় গ্রীক, পাঠান, মোগলজাতিরা পরে পরে আসিয়া ভারত অধিকার করিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কোহিনূরও তাঁহাদের আয়ত্তাধীন হইল। এই অমূল্যনিধি তাঁহাদের আয়ত্তাধীন হইবার পরেই তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইল।

মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে আকবর সার নামই বিখ্যাত ছিল, কারণ তিনি সুবিচারে প্রজা পালন করিতেন। আকবর সাহের যে দোষ ছিল না তাহা নহে, তবে তাঁহার দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগই বেশী ছিল। তিনি হিন্দু মুসলমানের প্রতি সমান ব্যবহার করিতেন। যদিও তিনি হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া নামক কর স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার হিন্দু সম্রাজ্ঞীর অনুরোধে ইহা অন্যায় বিবেচনা করিয়া উঠাইয়া দিয়াছিলেন। মোটের উপর তিনি মন্দ লোক ছিলেন না। এইজন্য তাঁহার যশ ইতিহাসে বর্ণিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেলিম, জাহাঙ্গীর উপাধি লইয়া ভারত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। আকবর সাহের জীবদ্দশাতেই তাঁহার অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল, তৎপরে সম্রাট হইবার পর তাঁহার অত্যাচার দিন দিন আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেলিমের মৃত্যুর পর সাজাহান ভারতের সম্রাট হইলেন; তিনিও তাঁহার পিতার রাজত্বকালেই অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সম্রাট হইবার পর ক্রমেই তাঁহার অত্যাচার বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। সাজাহানের মৃত্যুর পর আরঙ্গজেব ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্রদিগের শোণিতে দুই হস্ত রঞ্জিত করিয়া সগর্ব্বে ভারত সিংহাসনে

আরোহণ করিলেন। তাঁহার অত্যাচার এবং ব্যভিচার চরম সীমায় উঠিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সূত্রপাত হইল এবং ক্রমে সেই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

তাহার পর ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজজাতির উপর সুপ্রসন্ন হইলেন। ইংরাজ বাহুবলে ভারত অধিকার করিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কোহিনূরও আয়ত্ত করিল। ইহার পূর্ব্বে ইংরাজ রাজত্ব অতি সামান্য মাত্র ছিল। ভারত অধিকার করিবার পরেই তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইল। দিন দিন তাঁহাদের বল, বুদ্ধি, জ্ঞান বিজ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এখন আরও বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী সদাই চঞ্চলা, এক স্থানে স্থির থাকিতে পারেন না। আবার কবে কাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন তিনিই জানেন। ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানবের তাহা অগোচর। যাহা হউক, ভারতের ইতিহাস বর্ণনা করা এস্থলে আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কেবল কোহিনূরের ইতিহাস প্রসঙ্গে এত কথা বলিতে হইল। ভারতভূমি যে জগতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশ সেই কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রকৃতিদেবী স্বয়ং ভারতে বিরাজ করিতেছেন; তাঁহারই রত্নগর্ভ হইতে এই অমূল্য রত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল। যে রত্ন এই বিশাল জগতে আর কোথাও পাওয়া যায় না, সেই রত্নকে ক্রমে ক্রমে কর্ত্তন করিয়া তাহার আকারকে ক্ষুদ্র করা সুবুদ্ধির কাজ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয় না।

ভারতের ধন ঐশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশায় ইয়োরোপের রাজারা কতকাল যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছিলেন। এখনও ভারত লাভের প্রত্যাশায় নানাদেশে মন্ত্রণা চলিতেছে। এই বিশাল জগতের মধ্যে কেবল ভারত যে কিসে এত উর্ব্বরা এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশ বলিয়া গণ্য হইল তাহার প্রকৃত কারণ আমাদের অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। আমরা ভূতত্ত্ববিদ্ নহি, সুতরাং তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করেন সে পথ অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। যে সূত্র অদ্যাবধি কেহ অবলম্বন করে নাই, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। আমরা যে সূত্র অবলম্বন করিব তাহা অতি সামান্য। আজকালকার শিক্ষিত লোকেরা হয়তো শুনিয়া হাসিবেন, যাঁহারা বিজ্ঞানবিদ্ তাঁহারা হয়তো বলিবেন এ সকল বাতুলের কথা, ইহা শুনিবার যোগ্য নহে। বস্তুতঃ আমাদের কথা এখনকার শিক্ষিত ব্যক্তি-দিগের সহিত মিলিবে না। আমাদের কথা বাতুলের কথা হউক আর

তাঁহাদের মতের সহিত নাই মিল হউক, তথাপি আমরা তাঁহাদের শুনিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

ভারতের আকার ত্রিকোণ বিশিষ্ট। ত্রিকোণ ভূমি স্বভাবতঃই অশেষ গুণশালী হইয়া থাকে। প্রকৃতিদেবীর আকারও ত্রিকোণবিশিষ্ট। ভারত ভূমি তাঁহার আকারের অনুরূপ, এইজন্য ভারতভূমি এত উর্ব্বরা এবং ধন-রত্নে পূর্ণা। প্রকৃতিদেবী ষড়-ঐশ্বর্য্যবতী, সেই কারণে তাঁহার অনুরূপ আকৃতি ভারতকেও ষড় ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবতী করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের জানা উচিত যে প্রকৃতি কাহাকে বলে, এবং তাঁহার উৎপত্তি কোথা হইতে এবং তাঁহার নাম প্রকৃতিই বা কেন হইল। প্রকৃতির 'প্র' অর্থে প্রথম, আর 'কৃ' অর্থে করা, অর্থাৎ প্রথম করা বা প্রথমে করা। আর এক অর্থ আছে যথা 'প্র' অর্থে প্রকৃষ্টরূপে, আর 'কৃ' অর্থে করা, অর্থাৎ যাঁহাদ্বারা অনাদি কাল হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য প্রকৃষ্টরূপে সমাধা হইতেছে, তিনিই প্রকৃতি পদবাচ্য। এখন তাঁহার উৎপত্তি কোথা হইতে তাহাই দেখা যাউক।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিরাকার; তিনি অনাদি, অনন্ত ও অসীম। তিনি সঙ্কল্প বিকল্প রহিত, তাঁহার ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই নাই। যখন সেই নির্গুণ ব্রহ্মের অনিচ্ছার ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প হইল তখন তিনি বৃহৎ কুটস্থরূপে প্রকাশ হইলেন। অর্থাৎ গোলাপ পুষ্প বিকশিত হইবার পূর্ব্বে যেমন তাহার মুখটী ঈষৎ খুলিয়া গিয়া সেই ঈষৎ বিকশিত স্থানে ঈষৎ গোলাপী আভা দেখা যায়, সেই প্রকার নির্গুণ ব্রহ্ম গোলাপ পুষ্পের ন্যায় বিকশিত হইলেন, অর্থাৎ প্রকাশ হইলেন। আর যে অংশটুকুতে তিনি প্রকাশ হইলেন, সেই স্থানটুকুকেই কুটস্থ গহ্বর বলে। গোলাপ পুষ্পের প্রস্ফুটিত স্থানটুকুতে যেমন ঈষৎ গোলাপী আভা দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মের প্রকাশমান স্থান হইতে অর্থাৎ কুটস্থ গহ্বর হইতে একটী জ্যোতির প্রকাশ হইল। এই জ্যোতিকেই ব্রহ্মজ্যোতিঃ কহে। যদি সহস্র পূর্ণচন্দ্র এককালীন উদয় হয় তথাপি সেই জ্যোতির সহিত তুলনা হয় না। ইহা বিমল জ্যোতিঃ, এ জ্যোতিতে দগ্ধ করে না, ইহা দর্শন করিলে মন প্রাণ শীতল ও পুলকিত হয়। এই জ্যোতিই দেখিবার জিনিষ। যোগী ঋষিরা এই জ্যোতিঃ দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যান। তখন তাঁহাদের আর পৃথক সত্তাবোধ থাকে না। এই জ্যোতির মধ্যস্থলে একটী ত্রিকোণ আকার চিহ্ন দেখা যায়, ইহাই প্রকৃতির রূপ।

এই স্থানে যাহা ব্যক্ত করা গেল, তাহা সাধন দ্বারা নিজ বোধরূপ। ইহা মুখে বলিয়া বা লিখিয়া বুঝাইবার বিষয় নয়, যতদূর প্রকাশ করা সম্ভব তাহা করা গেল। এই কুটস্থ গহ্বর মধ্যে সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবতের রূপ দেখা যায়। কিন্তু তাহা সাধন সাপেক্ষ।

প্রকৃতিদেবীর ত্রিকোণ আকারে বুঝিতে হইবে যে তিনি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃগুণ বিশিষ্টা। নির্গুণ ব্রহ্ম এইরূপে সগুণ সাকার হইলেন। যখন তিনি সগুণ সাকার হইলেন তখন তিনি প্রকৃতি পদবাচ্য হইলেন। প্রথম সৃষ্টি এই, সেই জন্য তাঁহার নাম হইল প্রকৃতি, অর্থাৎ প্রথম করা। এই স্থলে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম দুইই এক, এবং অনাদি, অনন্ত এবং অসীম ইঁহারা কেহই কোন অংশে কাহারও ন্যূন নহেন, তাই তুলসিদাস বলিয়াছেন,

> নির্গুণ হেয় সো পিতা হামারা, সগুণ হেয় মাহতারি।
> কাকে নিন্দো কাকে বন্দো, দুয়ো পাল্লা ভারী ॥

এই সগুণা প্রকৃতি প্রকাশ হইলেন সত্য, কিন্তু তিনি এখন জড়ভাবাপন্ন, অর্থাৎ তিনি এখনও কার্য্যক্ষম হন নাই। যখন নির্গুণ ব্রহ্ম বিন্দুরূপে অবতীভূত হইয়া প্রকৃতিগত হইবেন অর্থাৎ বিন্দুরূপে প্রকৃতিতে প্রবেশ করিবেন, তখনই প্রকৃতিদেবী স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়া সৃষ্টি কার্য্যে সক্ষম হইবেন। নির্গুণ ব্রহ্ম কিরূপে প্রকৃতিগত হন তাহা লিখিয়া বুঝান যায় না; ইহা সাধন দ্বারা নিজ বোধরূপ, তবে যতদূর সম্ভব তাহা প্রকাশ করা হইল। এই সকল অতি গূহ্য বিষয়, যোগী ঋষিরা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন, অন্যের পক্ষে বুঝা অসম্ভব। ইহা কল্পনার বিষয় নয়। যোগীরা ষট্‌চক্রের ক্রিয়া দ্বারা আপনার দেহেতেই দিব্য চক্ষু দ্বারা প্রকৃতি পুরুষের মিলিতভাব দেখেন। আর দেখিতে দেখিতে ভাবে বিমোহিত ও তন্ময় হইয়া আত্মহারা হইয়া যান। আপন দেহেতে দেখেন বলা হইল কেন, অর্থাৎ এই দেহই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে আছে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অনুকরণই এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড।

> দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপ সমন্বিতঃ।
> সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্র পালকাঃ ॥ ১

ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রানি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥ ২
সৃষ্টি সংহার কর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশীভাস্করৌ।
নভোবায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ॥ ৩
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বানি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহার প্রবর্ত্ততে॥ ৪

শিবসংহিতা ২য় পটলঃ।

তৎপরে সৃষ্টি কার্য্য কিরূপে আরম্ভ হইল, তাহা বলা উদ্দেশ্য নয়, আর তাহা বলিবারও এস্থলে আবশ্যক নাই। তবে সৃষ্টি সম্বন্ধে ভগবান ত্রিকোণ আকার চিহ্নকে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বেশ বুঝা যায়। যথা:—

মমযোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভব সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥

গীতা ১৪ অঃ ৩য় শ।

অর্থাৎ হে ভারত, মহদ্‌ব্রহ্ম আমার যোনি (গর্ভাধান স্থান) এবং ইহাতে আমি গর্ভ (জগদ্ বিস্তারের হেতুস্বরূপ চিদাভাস) নিক্ষেপ করি, তাহা হইতেই সকলের উৎপত্তি হয়। যোনি অর্থাৎ কুটস্থ মধ্যস্থিত ত্রিকোণ আকার চিহ্নকেই উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে। এই ত্রিকোণ যন্ত্রকেই ব্রহ্মযোনি বলে।

এক্ষণে প্রকৃতির আকৃতির অনুরূপ ভারত কিরূপে হইল তাহাও আমাদের জানা আবশ্যক। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ জীবদেহে মেরুদণ্ডই প্রধান। জীবদেহ পূর্ণভাবে বিকশিত হইবার পূর্ব্বে নারীক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত বীজ হইতে প্রথমেই মেরুদণ্ড গঠিত হয়, তাহার পর অস্থি, পঞ্জর, মেরুদণ্ড হইতে অঙ্কুরিত হয়। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে মহাপ্রাণ বা স্থির প্রাণ অবস্থান করেন। সেই শক্তির প্রভাবে জীবদেহ পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। বহির্জগতে হিমালয় পর্ব্বতই পৃথিবীর মেরুদণ্ড। প্রকৃতির নৈসর্গিক গুণে জলের পর ক্ষিতির উৎপত্তি হইবার সময় মৃত্তিকার অণুগুলি ক্রমে ক্রমে একত্রিত হইয়া স্তুপাকার মৃত্তিকাখণ্ড পৃথিবীর মেরুদণ্ডরূপে হিমালয় পর্ব্বত প্রকাশ হইল। তৎপরে হিমালয়রূপ মেরুদণ্ড হইতে অস্থি পঞ্জররূপে ক্রমে ক্রমে এই ভারতভূমি প্রকাশ

হইল। প্রকৃতিদেবীর এই প্রথম ভূখণ্ড সৃষ্টি বলিয়া তিনি নিজাকারে অর্থাৎ ত্রিকোণ আকারে ভারতভূমিরূপে প্রকাশিত হইলেন।

প্রকৃতির উৎপত্তি অনন্ত অসীম হইতে এবং তাঁহার লয়ও অনন্তে ও অসীমে। বহির্জগতেও ভারতরূপা প্রকৃতি অনন্তপর্ব্বতমালাসংযুক্ত হিমালয়ের তলদেশ হইতে ত্রিকোণ আকারে প্রকাশিত হইয়া অনন্ত সমুদ্রে মিশিয়াছেন। এইরূপ আকারের এবং এই ভাবে অবস্থিত আর কোন দেশই দেখা যায় না। সূক্ষ্ম দৃষ্টে দেখিলে বোধ হয় যে প্রকৃতিদেবী স্বয়ং এইস্থানে অবস্থান করিতেছেন। এই জমির গুণ বিচার করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে ইহার তুল্য জমি জগতে আর কোথাও নাই, জগতের এই প্রথম মৃত্তিকা বলিয়া ইহা এত উর্ব্বরা। এখানকার লোকের মস্তিষ্কও সেই কারণে এত উর্ব্বরা। এখানকার লোকের বলও অত্যন্ত বেশী। এখানকার ক্ষেত্রজাত ফসল সকল অত্যন্ত শক্তিশালী, কেবল যে শক্তিশালী তাহা নহে, সত্বগুণবিশিষ্ট এবং সেই সকল শক্তিশালী এবং সত্বগুণশালী দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া এখানকার লোক শক্তিশালী এবং মেধাবী হয়। তাহার প্রমাণ মুনিঋষিগণ। তাঁহারা যে সকল শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যে কি গভীর জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। আজকাল এত বিদ্যার চর্চ্চা সত্বেও কই কেহ তো আর তেমনটী লিখিতে পারেন না? সেরূপ আর হইবার নয়, সেদিন, আর সেই সকল লোক চলিয়া গিয়াছে। এক সাধনের অভাবে সকলই হীন ভাবাপন্ন হইতেছে।

ভারতের ক্ষেত্রজাত ফসলাদি এবং খনিজ দ্রব্যাদি এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত, এবং এখনও প্রায় সেই রকমই উৎপন্ন হইতেছে, যে ভারতবাসীরা সেই সকল দ্রব্য উদার হস্তে ব্যয় করিয়াও ফুরাইতে পারিতেন না। তাঁহারা সেই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য অন্য দেশের লোকের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া কালে প্রচুর ধনশালী হইয়াছিলেন। ক্রমে সেই সকল ধন ঐশ্বর্য্য এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে সেই সকল ধনরত্ন লাভের জন্য লোলুপ হইয়া বিদেশীয় নরপতিগণ একে একে ভারত আক্রমণ করিলেন। ভারতবাসীরা আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেই রত ছিলেন, কারণ তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় রত থাকিতে হইত না, সেইজন্য দেশ রক্ষার জন্যও ভাবিতেন না। সুতরাং বিদেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া পরাধীন হইয়া পড়িলেন।

এই সকল ঐশ্বর্য্য ব্যতীত ভারতে আর একটী অমূল্য রত্ন আছে। যাহা কোটি কোটি কোহিনূরের বিনিময়েও জগতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। যাহা পাইলে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতর জ্ঞান হয়। যাহা পাইলে জ্ঞান বিজ্ঞান করতলস্থ হয়, সেই রত্ন ভারতে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। সেই রত্ন কি? সেই রত্নটী প্রকৃতিদেবীকে জানিবার এবং দেখিবার বিদ্যা। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এবং তাঁহাতে লয় হইয়া জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার বিদ্যা বা কৌশল। সেই বিদ্যাটী প্রকৃতিদেবী নিজাকৃতি দেশ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ অন্য দেশের লোক ইহা পাইবার এখনও যোগ্য হয় নাই। সেই রত্নের নাম "যোগবিদ্যা"। এই যোগবিদ্যা ত্রিকোণ ভূমিবাসীদের উর্ব্বরা মস্তিষ্ক হইতেই প্রকৃতিদেবীর কৃপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং সেই দেশেতেই সত্যযুগ হইতে অদ্যাবধি আবদ্ধ আছে। অন্য দেশের লোক ভাগ্যক্রমে ইহা পাইলেও কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে না, কারণ তাঁহারা মাংসাশী ও মদ্যপায়ী, সুতরাং সত্বগুণ বিবর্জ্জিত। সত্বগুনী ব্যক্তি ব্যতীত ইহা আর কাহারও পাইবার অধিকার নাই। পুরাকালে মুনিঋষিগণ কেবল এই যোগবিদ্যার বলেই জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা যোগবলে সূক্ষ্মদর্শী হইয়া জীবের উপকারের জন্য অভ্রান্ত শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সে সকল গ্রন্থের তুলনা জগতে আর কোথাও নাই।

আমরা জানি, যোগের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয়, জার্ম্মাণীর একজন বিখ্যাত ডাক্তার, কোন সংস্কৃত গ্রন্থে পাঠ করিয়া যোগশিক্ষা করিবার জন্য সস্ত্রীক ভারতে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও যোগশিক্ষা করিবার সন্ধান না পাইয়া অবশেষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া ভাগ্যক্রমে একজন বড়লোকের সহায়ে একজন যোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পরে সেই যোগীকে তিনি তাঁহার কলিকাতায় আসিবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার কাছে যোগের উপদেশ প্রার্থনা করেন। যোগীবর ডাক্তার সাহেবের অভিপ্রায় শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন যে, আপনি বৃথা কষ্ট করিয়া এদেশে আসিয়াছেন। যোগ সম্বন্ধে আপনি উপদেশ পাইতে পারেন না; কারণ আপনি মাংসাসী ও মদ্যপায়ী, আপনার আচার ব্যবহার হিন্দুদিগের সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দু ব্যতীত আর কেহ ইহার অধিকারী হইতে পারে না, সুতরাং আমি কিছুতেই আপনাকে যোগ বিষয়ক

উপদেশ দিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে আপনার প্রাণের অনিষ্ট হইবে। বিদেশী ডাক্তার মহাশয় এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত হতাশ হইয়া নানা প্রকার কাকুতি ও মিনতি করিলেন, অবশেষে সজল নয়নে যোগীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া যোগীবর দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন যে, দেখুন আপনি বৃথা কাতর হইতেছেন আপনাকে উপদেশ দিবার উপায় থাকিলে আমি নিশ্চয়ই দিতাম, কিন্তু তাহার কোন উপায় নাই। তবে আপনি অনেক দূরদেশ হইতে আশা করিয়া এদেশে আসিয়াছেন, সেইজন্য যোগের গূঢ় রহস্য আপনাকে কিছু শুনাইব এবং দেখাইব। আর আপনাদের একবারে নৈরাশ করিতেও আমার দুঃখ হইতেছে, সেইজন্য বলিতেছি আমি আপনার স্ত্রীকে যোগের বিষয় কিছু উপদেশ দিব। তিনি শক্তিরূপা, তাঁহাকে উপদেশ দিবার বিশেষ কোন বাধা নাই। কিন্তু আমি তাঁহাকে আমাদের শাস্ত্রানুসারে প্রথমে শুদ্ধ করাইয়া এবং হিন্দু রমণীর ন্যায় বেশভূষা পরাইয়া তাহার পর উপদেশ দিব। আর যতদিন তিনি যোগ অভ্যাসে রত থাকিবেন ততদিন তাঁহাকে মদ্য মাংস পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুদিগের ন্যায় আহারাদি করিতে হইবে। যদি আপনারা উভয়ে ইহাতে সম্মত হন তাহা হইলে দিন স্থির করিয়া সেই দিন আপনাদের উভয়কে যোগের গূঢ় রহস্য শুনাইব, আর আপনার স্ত্রীকে আপনার অন্তরালে উপদেশ দিব। উপদেশ মত সাধন ভজন করিলে তিনি শীঘ্রই ইহার ফল জানিতে পারিবেন। কারণ স্ত্রীলোক শক্তিরূপা, পুরুষ অপেক্ষা তাঁহাদের শক্তি অনেক বেশী সুতরাং তিনি শীঘ্রই ফলবতী হইবেন। এইস্থলে আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে নারীজাতি পুরুষ অপেক্ষা ভোজনে দ্বিগুণ, বুদ্ধিতে চতুর্গুণ, ব্যবসাতে ও কামে অষ্টগুণ শক্তি ধারণ করিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, ডাক্তার সাহেব সেই কথাতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং সেইদিন হইতে চারি দিন পরে উপদেশ দিবার দিন ও সময় ধার্য্য হইল। সেইদিন যথাসময়ে তাঁহারা আসিলে পর সেই জার্ম্মাণ রমণীকে স্নান করাইয়া হিন্দু রমণীর বেশে সজ্জিত করান হইল। এই সকল কার্য্য করাইবার জন্য গুরুদেব দুইজন বাঙ্গালী পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং বেনারসী চেলি, সামিজ প্রভৃতি সমস্তই নিজ ব্যয়েতেই আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরে স্নান ও বেশভূষা সমাপ্ত হইলে দুইজনকে একটী ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাদের উভয়কে যোগের গূঢ় রহস্য সকল বলিলেন এবং বলা শেষ হইলে

পর, সাহেবকে ঘরের বাহিরে যাইতে অনুমতি করিলেন। সাহেব বাহিরে যাইবার পর সেই রমণীকে তিনি যোগের উপদেশ দিলেন। তৎপরে সাহেবকে ঘরের ভিতরে আসিতে অনুমতি দিলেন। রমণী দীক্ষা পাইয়া আনন্দে তাঁহার চক্ষু দিয়া আনন্দবারি পড়িতে লাগিল, তিনি সেই অবস্থাতেই গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। ডাক্তার সাহেবও গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পরে তাঁহারা বিদায় লইয়া আনন্দে প্রস্থান করিলেন। যতদিন তাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন প্রায় প্রত্যহই গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিবার দিন তাঁহারা গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, সেইদিন তাঁহারা প্রচুর অর্থ আনিয়া গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দিতে প্রস্তুত হইলেন। গুরুদেব একটী কপর্দ্দকও স্পর্শ করিলেন না, কেবল বলিলেন যে আমি উপদেশ দান করিয়া অর্থ গ্রহণ করি না, আশীর্ব্বাদ করি আপনারা নিরাপদে স্বদেশে যাইয়া উপস্থিত হউন। সাহেব ও রমণী ইহাতে কিছু ক্ষুণ্ণমনা হইলেন। পরে সাহেব বলিলেন, আপনি যদি অর্থ নাই গ্রহণ করেন তবে আপনার এই শিষ্যদ্বয়কে স্মরণ রাখিবার জন্য আমার এই ফটোখানি গ্রহণ করিয়া আপ্যায়িত করুন। গুরুদেব হাস্যবদনে সেই ফটোখানি গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, সেই ফটোর নিম্নস্থলে সাহেবের নিজ হস্তে লেখা আছে—In memory to my revered Guru Sree—লেখক সেই সাহেব ও রমণীকে দেখেন নাই, তবে সেই ফটোখানি গুরুদেবের ঘরে বহুদিন যাবৎ থাকিতে দেখিয়াছেন।

তাঁহারা স্বদেশে পৌঁছিয়া প্রায় দুই বৎসর কাল গুরুদেবকে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাহার পর আর কোন সম্বাদ পাওয়া যায় নাই। এই ঘটনার প্রায় চারি বৎসর পরে এই জার্ম্মাণ রমণী পুনরায় গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। যে সময় তিনি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন সন্ধ্যাকাল, বাটীর সন্ধান করিতে না পারিয়া প্রায় রাত্র ১১টা পর্য্যন্ত এ রাস্তা সে রাস্তা অনুসন্ধান করিয়াও গুরুদেবের বাটী খুঁজিয়া পান নাই। অবশেষে একটী ভদ্রলোক তাঁহাকে বাটী দেখাইয়া দেন এবং সেই বাটীতে যাইয়া গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রমণী যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, দুই চারি দিন অন্তর আসিয়া গুরুদেবের নিকট হইতে যোগ সম্বন্ধে উপদেশ লইয়া যাইতেন। তিনি যখনই দেখা করিতে আসিতেন তখনই একটী

ফুলের তোড়া আনিয়া গুরুদেবকে উপহার দিতেন। তিনি দ্বিতীয়বার আসিয়া এখানে গ্র্যাণ্ড হোটেলে অবস্থান করিয়াছিলেন। গুরুদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আপনি মধ্যে মধ্যে আমার হোটেলে যাইয়া দর্শন দিবেন। তাহাতে গুরুদেব বলেন যে এবারে আপনার স্বামী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন নাই, সুতরাং আমি সেখানে যাইতে অক্ষম। এই কথা শুনিয়া রমণী বিষণ্ণ বদনে বলিলেন যে তাঁহার স্বামী ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তিনি জীবিত থাকিলে অবশ্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এই বলিয়া রমণী রুমালে চক্ষের বারি মুছিতে লাগিলেন। এই কথা শুনিয়া গুরুদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন আমি দুই চারি দিন অন্তর হোটেলে যাইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব। আপনি মনস্থির করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হউন। রমণী যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সেদিন প্রস্থান করিলেন। ইহার পর গুরুদেব মধ্যে মধ্যে হোটেলে যাইয়া দেখা করিয়া আসিতেন। এই জার্ম্মাণ রমণী একজন খুব উচ্চশ্রেণীর মহিলা। কলিকাতায় অনেক বড় বড় সাহেব তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। সুতরাং গুরুদেব যখন সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তখন প্রায়ই একজন দুইজন উচ্চশ্রেণীর সাহেব কামরায় উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু যেই মাত্র রমণী গুরুদেবের আগমন সম্বাদ পাইতেন সেই মাত্র কামরায় যত বড় উচ্চ শ্রেণীর সাহেব উপস্থিত থাকুন না কেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বিদায় দিয়া আপনি স্বয়ং নামিয়া আসিয়া গুরুদেবের কর ধারণ করিয়া উপরে লইয়া যাইতেন এবং বেহারাকে হুকুম দিতেন যে যতক্ষণ আমার গুরুদেব কামরায় থাকিবেন, যে কেহ আসুন তাঁহাকে কামরায় প্রবেশ করিতে দিবে না।

রমণী কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া স্বদেশে যাইবার উদ্‌যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবার দিন গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন যে, আমার স্বামী অনেক অর্থ রাখিয়া মারা গিয়াছেন, যদ্যপি আপনি তাহার কিঞ্চিৎ গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। কিন্তু গুরুদেব অর্থ লইতে কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। বিদায় লইবার কালীন কেবল এই মাত্র বলিলেন,—কেন বলিলেন তাহা বলিতে পারি না, বোধ হয় ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়াছিলেন সেই জন্য— যে পথে আপনার যদি কোন বিপদ হয় তাহা হইলে আমাকে স্মরণ

করিতে ভুলিবেন না। রমণী স্বীকৃত হইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সমুদ্রপথে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি উঠিয়া জাহাজকে বাণচাল করিয়া দিল। জাহাজ রক্ষা করিবার ক্ষমতা কাপ্তেন সাহেবের সাধ্যাতীত হইয়া উঠিল। কাপ্তেন সাহেব আরোহীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে আমি জাহাজ রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি ও করিব, কিন্তু বোধ হয় জাহাজ রক্ষা করা যাইবে না, অতএব আপনারা সকলে ঈশ্বরের নাম লউন। এই কথা শুনিবামাত্র জাহাজে ক্রন্দনের রোল উঠিল। রমণী প্রায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন। ভাগ্যবশতঃ গুরুদেবের কথা তাঁহার স্মরণ ছিল, তাই তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন গুরুদেব রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! গেলাম! গেলাম! আর এদিকে ঘন ঘন বজ্রপাত শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে। জাহাজের মধ্যে কেবল ভগবান রক্ষা করুণ, রক্ষা করুণ শব্দ হইতেছে। আবার সেই মুহূর্ত্তে পর্ব্বত সদৃশ তরঙ্গমালা সবেগে আসিয়া জাহাজের পার্শ্বদেশে ভীষণ আঘাত করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন সেই মুহূর্ত্তে জাহাজখানি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যাইবে! রমণী যখন গুরুদেব রক্ষা করুন, রক্ষা করুন বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার কেবিনের মধ্যে এক প্রকার জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া গেল। রমণী ভাবিলেন তাঁহার কেবিনে আগুণ লাগিয়াছে। ভয়ে তাঁহার সংজ্ঞা তিরোহিত হইবার উপক্রম হইল। রমণী জ্যোতির দিকে যেমন চাহিলেন, অমনি দেখিলেন যেন গুরুদেবের মূর্ত্তি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন মা! তোমার কোন ভয় নাই, আমি আসিয়াছি। এই কথা শুনিবামাত্র সেই জ্যোতিঃ অদৃশ্য হইয়া কেবিন অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে রমণীরও চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহার পর যে কি ঘটনা হইল, রমণী তাহা বলিতে পারেন না। পরে যখন তাঁহার সংজ্ঞা হইল তখন তিনি কেবিনের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সেই জ্যোতির্ম্ময় গুরুদেবের মূর্ত্তি জাহাজের হালের কাছে দাঁড়াইয়া আছে! এখন আর ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত কিছুই নাই। বিমল্ চন্দ্রালোকে জাহাজখানি ধীর এবং মন্থরগতিতে চলিয়া যাইতেছে। রমণী এইটী দেখিবার অনতি পরেই সেই জ্যোতিঃ শূন্যে বিলীন হইয়া গেল! এই ঘটনা আমাদের কল্পনাপ্রসূত নয়, ইহা সত্য।

রমণী স্বদেশে পৌঁছিয়াই এই আশ্চর্য্য ঘটনাটি আমূল বর্ণনা করিয়া গুরু-

দেবকে ইংরাজিতে একখানি বৃহদাকারের পত্র লিখিয়াছিলেন। গুরুদেব পত্র পাঠ করিয়া কোন কথাই বলিলেন না; কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্রখানি প্রধান শিষ্যের হস্তে দিয়া বলিলেন যে এই পত্রখানি রাখিয়া দিন। প্রধান শিষ্য সেই সময় অন্য অন্য যে সকল শিষ্য উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সকলকেই পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। রমণী এই আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় তাঁহার সকল বন্ধুবান্ধবের নিকট গল্প করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই উচ্চশ্রেণীর মহিলা, গুরুদেবকে দেখিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত রমণীকে বলিল, যে আমরা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তাঁহাকে আমাদের দেশে আনাইয়া দেখিব, অতএব তুমি এই মর্ম্মে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখ। রমণী অত্যন্ত কাতরভাবে গুরুদেবকে লইয়া যাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে আপনি ব্যয়ের জন্য কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না, আপনি যে ভাবে এখানে আসিতে চাহেন সেই ভাবে একবার এইখানে আসুন। যদি একখানি স্বতন্ত্র জাহাজ ভাড়া করিয়া আসিতে ইচ্ছা করেন তাই আসিবেন। জাহাজে আপনার ইচ্ছামত লোকজন ও চার মাসের খাদ্য-দ্রব্য এবং যাহা অভিরুচি হয় সমস্তই আনিবেন, আমরা ব্যয়ের জন্য কাতর হইব না। আমরা আপনাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়া আছি। যদি আপনি আমাদের দেশে পদার্পণ করিতে না চাহেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, আমরা জাহাজে গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব। আমাদের মধ্যে অনেকেই আপনার শিষ্য হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন। গুরুদেব এই পত্র পাইয়া কোন কোন শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে জার্ম্মাণী হইতে আমার নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে, আপনারা কেহ আমার সঙ্গে যাইবেন কি? অনেকেই আনন্দের সহিত যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর গুরুদেব জার্ম্মাণীতে গিয়া-ছিলেন কি না তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এইখানেই এই গল্পের শেষ। লেখক সেই মহাত্মার একজন অধম শিষ্য। আজ কয়েক বৎসর হইল গুরুদেব তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার নাম প্রকাশ করিলাম না। তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, এই আমাদের বিশ্বাস। সেই জন্য তাঁহার চরণে কোটি কোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইতেছি।

আমরা কথাপ্রসঙ্গে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আবার

সেই পরিত্যক্ত স্থান হইতেই আরম্ভ করিব। আমরা যোগের মাহাত্মের বিষয় বলিতেছিলাম। আমাদের মুনিঋষিগণ যোগবলে অদ্ভুত কার্য্য সকল করিতে পারিতেন। এখন আমরা একখানা এরোপ্লেন দেখিয়া ইয়োরোপবাসীর কীর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকি। কিন্তু আমরা একবারও ভাবি না যে ইয়োরোপ যখন ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, ভারতে তখন এরোপ্লেন চলিত। নলরাজার পুষ্পরথের কথা ভাবিয়া দেখুন। ইন্দ্রজিতের মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করার কথা ভাবিয়া দেখুন, নারদের ঢেঁকী চড়িয়া স্বর্গে গমনাগমনের কথা ভাবিয়া দেখুন। আর রাবণ রাজা সীতাকে হরণ করিয়া শূন্য পথে রথে চড়িয়া সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন তাহাও ভাবিয়া দেখুন। এই সকল বিষয় মহাভারতে পাঠ করিয়া আমরা অলীক মনে করিতাম। কিন্তু যখন জার্ম্মাণ যুদ্ধে এরোপ্লেন আবিষ্কার হইল, তখন আমরা মহাভারতে লিখিত পুষ্পরথের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু পুষ্পরথ বা এরোপ্লেন কি সামান্য বিষয়, যে দেশের লোক যোগবলে শূন্যে পুরী নির্ম্মাণ করিতে পারিত, মৃত মানুষকে বাঁচাইতে পারিত, তাঁহাদের পক্ষে জগতে কিছুই বিচিত্র ব্যাপার ছিল না।

আমরা এখন ব্যাধির ঔষধের জন্য বিদেশীয় ভৈষজ বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাই, কিন্তু আমাদের দেশে যে কি রত্ন আছে তাহা একবারও খুঁজিয়া দেখি না, দেখিলেও অতি অপদার্থ ভাবিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকি। যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের তুলনা জগতে কোথাও নাই, সেই শাস্ত্রকে অতি অকিঞ্চিৎকর বোধে তাহার চর্চ্চা করিতে বিরত হই। বিদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে আমাদের দেহ, দুগ্ধ, ঘৃত এবং ক্ষেত্রজাত শস্যাদির রসে পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং সেই দেহের ব্যাধির প্রতিকারের জন্য তদুপযোগী ভেষজও এই স্থানেই উৎপন্ন হয়। সেই সকল ভেষজ দ্বারা যত ফল পাওয়া যায়, এমন আর অন্য কোন দেশীয় ভেষজে পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ ভগবান যে দেশে যে ভেষজ উপকারী তাহা পূর্ব্বেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। অন্য দেশের লোক মাংসাশী ও মদ্যপায়ী, সেই সেই দেশের উপযোগী ভেষজ তিনি সেই সেই দেশেই সৃষ্টি করিয়াছেন। মাংসাশী-দের যে ভেষজ উপকারী তাহা শস্যজীবীদের পক্ষে কখন উপযোগী হইতে পারে না ইহাতে অপকারই করিয়া থাকে। আমরা আজকাল সেই সকল ভেষজ ব্যবহার করি বলিয়া আমাদের দেশে এত ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে এবং

সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে। অবশ্য মৃত্যুর ও ব্যাধির সংখ্যা যে কেবল এই জন্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নহে, বহুল সংখ্যায় বিদেশীয় লোকের আমদানী ও রেলপথ যে ইহার অন্যতম কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন আয়ুর্ব্বেদে অস্ত্র চিকিৎসা বিদ্যা নাই; ইহা একেবারেই ভুল। অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যা তো আছেই, তাহা ব্যতীত পুরাকালের ভীষকগণ উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় এতদূর পারদর্শী ছিলেন যে অস্ত্রের কার্য্য তাঁহারা দেশীয় লতা-পাতায় সুন্দররূপে সমাধা করিয়া লইতেন। ইহাতে রোগীর কোন কষ্ট হইত না, আর তাঁহারাও পুঁযরক্ত স্পর্শ করিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ২।১টী উল্লেখ করিতেছি। যথা:—

তেলাকুচার পাতা চিনির সহিত বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

বাবুই তুলসীর বীজ রেড়ির তৈলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

ভুইচাঁপার মূল ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন আয়ুর্ব্বেদে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। সে কার্য্যও ভীষকগণ কেবল লতাপাতায় সারিতেন, প্রসূতী ও প্রসূত কোন কষ্ট পাইতেন না। এখনও সে কার্য্য অনেক স্থলে হয়। আবার কোন কোন স্থলে মন্ত্র ও কৌশলে সমাধা হয়। তাহার প্রমাণ আমাদের পঞ্জিকাতে সুখ প্রসবের ষত্রিশদর অঙ্কিত আছে, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই সত্য মিথ্যা জানিতে পারা যায়। সুখপ্রসবের লতা পাতার বিষয় এস্থলে আমরা ২।১টী উল্লেখ করিতেছি। যথা:—

শ্বেত পুনর্নবার শিকড় চূর্ণ করিয়া প্রসব দ্বারে দিলে সুখে প্রসব হয়।

বাসক গাছের উত্তর দিকের শিকড় সপ্ত সূত্রের দ্বারা গর্ভিনীর কটিদেশে বাঁধিয়া দিলে সুখে প্রসব হয়।

কাজলী মূল জলে পেষণ করতঃ তাহার কিয়দংশ প্রসব দ্বারে আর কিয়দংশ নাভীতে প্রলেপ দিলে সত্বর সুখে প্রসব হয়।

মন্ত্রের দ্বারা সুখ প্রসবের বিষয়ও ২।১টী বলিতেছি যথা:—

ওঁ মন্মথবাহিনী লম্বোদরং মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা, উষ্ণ জলে উক্ত মন্ত্র পাঠকরতঃ সেই জল গর্ভিনীকে সেবন করাইলে সুখে প্রসব হয়।

অং ওঁ হ্রাং নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে এই মন্ত্র সূতিকাগৃহে বসিয়া জপ করিলে গর্ভিনী সুখে

প্রসব হয়। এইরূপ আমাদের দেশে নানাপ্রকার লতা, পাতা ও মন্ত্র প্রভৃতি আছে যাহা দ্বারা আমরা আশ্চর্য্য ফল পাইয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সকল লতা পাতা খুঁজিয়া আনিবার লোক অভাব হইয়া পড়িয়াছে। সে অভাব আমরা নিজেই সৃষ্টি করিয়াছি। বেদেরা সেই সকল লতা পাতা অনুসন্ধান করিয়া আনিত, সে জাতি এখন প্রায় নাই বলিলেই হয়। তাহার কারণ এই যে, যখন এখানে বিদেশীয় ঔষধ আমদানি হইতে সূত্রপাত হইল, তখন দেশীয় লতাপাতার প্রতি হতাদর হইতে লাগিল। বিদেশীয় চিকিৎসকেরা আসিয়া এখানে ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে বৈদ্যদিগের ব্যবসা নষ্ট প্রায় হইয়া আসিল, ক্রমে ক্রমে বৈদ্যের সংখ্যা কম হইতে লাগিল। সুতরাং বেদেদিগের কাজও কমিয়া আসিল, এবং বিদেশীয় চিকিৎসা যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণে বৈদ্যের সংখ্যা ও বেদের সংখ্যা কমিয়া শেষে বৈদ্যের ও বেদের ব্যবসা একেবারে স্থগিত হইয়া গেল। বেদেদের অর্থের অভাবে অন্নকষ্ট হইল, সুতরাং তাহারা জাতি ব্যবসা ছাড়িয়া অন্য অন্য কাজে নিযুক্ত হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। এখন সেই সকল লতাপাতা অনুসন্ধান করিয়া আনা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বৈদ্যের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল, এখন আবার কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু বেদের সংখ্যা ন্যূন হওয়ায় লতাপাতা অনুসন্ধান করিয়া আনিবার লোক অভাবে বৈদ্যেরা যাহা তাহা দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করেন। সুতরাং সে সকল ঔষধ সমধিক ফলদায়ক হয় না। ফলে আয়ুর্ব্বেদের উপর লোকের শ্রদ্ধা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহা আয়ুর্ব্বেদের দোষ নয়, ইহা আমাদেরই দোষ এবং তাহার ফল আমরাই ভোগ করিতেছি। আমরা সহজেই সকল প্রকার বিদেশীয় দ্রব্যেতেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ি এবং স্বদেশীয় দ্রব্য হতাদর করিয়া থাকি, আমাদের দুরাবস্থার ইহা একটী প্রধান কারণ, ইহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহি না।

যাহা হউক, সে সকল বিষয় এখন চর্চ্চা করা বৃথা, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে যে আরও কি হইবে তাহা কেবল সেই অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। তবে এ কথা সত্য যে, ভারতবাসী হিন্দুদের যতদূর অধঃপতন হইবার তাহা হইয়াছে। আমরা বাহ্যিক চাকচিক্যে মনে করি যে আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু তাহা আমাদের একেবারেই ভ্রম। আমরা কেবল অবনতির দিকেই অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু অবনতির

কারণ যে কি, তাহা আমরা অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই জানিতে পারি। কিন্তু কে অনুসন্ধান করিবে? প্রথমতঃ আমরা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া এবং বিদেশীয় আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়া আমাদের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয় ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা এই অবস্থাকে অবনতি বলিয়া স্বীকার করি না, বরং এই অবস্থাকে উন্নত অবস্থাই বলিয়া থাকি। আর কখনই বা অনুসন্ধান করিবে? আমরা সমস্ত দিন কেবল উদরের খোরাকের জন্য ভ্রান্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছি। আমরা যাহা কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহার মূলে উদর, অথবা কামিনী ও কাঞ্চন বর্ত্তমান। কোন প্রকারে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া উদরের কার্য্যটা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইলেই আমরা বেশ সন্তোষ লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু ধর্ম্ম আর কর্ম্ম কি তাহা আমাদের জানিবার আবশ্যক হয় না। আমরা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া মিথ্যা জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া কর্ম্মকে অকর্ম্ম, আর ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া থাকি, তাহার ফলও আমরা সেইরূপ পাইয়া থাকি। হায়! অধঃপতনের সীমা আর কোথায়? সে এই। ঘনরাম কবি বলিয়াছেন—

"কি জানি পাতকী দীন, মন্দমতি অতি ক্ষীণ,
মায়ায় মোহিত মিথ্যা জ্ঞানী।
কোটি কোটি কীট যথা, আমার গণনা তথা,
আছে কি না আছে হীন প্রাণী॥"

যাঁহারা আমাদের এই অবস্থাকে উন্নত অবস্থা বলেন তাঁহারা বলুন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নাই, কিন্তু আমরা এই অবস্থাকে অবনতির অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে প্রস্তুত নয়। আর সেই অবনতির সূত্রপাত কোন সময়, কোথা হইতে এবং কি কারণেই বা হইল, তাহা একবার আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির সহায়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। অনুসন্ধানের ফল যাহা হয়, তাহা যদি এখনকার মিথ্যা জ্ঞানে জ্ঞানী লোকের গ্রাহনীয় না হয়, তাহাতে আমাদের অনুসন্ধান করিবার কোন আপত্তি দেখিতেছি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতির গতি বিচিত্র। তাঁহার লীলা খেলা বুঝা স্বল্পবুদ্ধি এবং বিকৃত মস্তিষ্ক মানবের পক্ষে অসম্ভব। তবে এইটি দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেখানে উন্নতি, সেইখানে অবনতি ধ্রুব নিশ্চিত। আর যেখানে অবনতি সেইখানে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। স্থির প্রাণই আত্মা, আর চঞ্চল প্রাণই প্রকৃতি পদবাচ্য। সুতরাং তিনি স্বভাবতঃই চঞ্চলা। তিনি এক স্থানে এক ভাবে স্থির থাকিতে পারেন না। প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি। গম ধাতু কিপ্ প্রত্যয় করিয়া জগৎ শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। গচ্ছতী-তি—জগৎ, অর্থাৎ যাহা যায় তাহাই জগৎ বা জগতের অন্তর্গত। আজ যে বস্তু বা বিষয় যেভাবে আছে, কাল সেভাব চলিয়া গিয়া আর একভাব প্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম যাওয়া। ইহাই চঞ্চলা প্রাণ শক্তিরূপা প্রকৃতির লীলাখেলা।

দ্বাপর যুগে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধন, ঐশ্বর্য্য উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল। সেই জন্য তাহার ধ্বংসেরও প্রয়োজন হইয়াছিল। দ্বাপর যুগে কুরুবংশীয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রই প্রধান রাজা ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, সেই জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা দুর্য্যোধনই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তিনি একজন মূর্ত্তিমান অহঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। যত প্রকার নীচ প্রবৃত্তি আছে, অর্থাৎ দম্ভ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। আর তাঁহার সভাতেই অবনতির প্রথম কারণ সৃষ্টি হইল। দম্ভের অবতার দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, সুখ্যাতির কথা সকল লোকের মুখে শুনিয়া হিংসা বিষে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। কি প্রকারে তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে পথের ভিখারী করিবেন, সেই উপায় সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে পাপমতি শকুনি মামার পরামর্শে—

পাপীর অনুচর পাপীই হইয়া থাকে, সাধু কখন পাপীর অনুচর হয় না—পাপমতি দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজকে পাশা খেলার প্রস্তাব করিলেন। ধর্ম্মরাজ পাশা খেলাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন, এবং তাহাতে বিশেষ পারদর্শীও ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ খেলিতে সম্মত হইলেন। এদিকে দুরাত্মা দুর্য্যোধন শকুনির পরামর্শে ছল পাশা খেলার আয়োজন করিলেন। খেলা আরম্ভ হইল। ধর্ম্মরাজের মনে এই ছলনার কোন প্রকার সন্দেহ ছিল না। তিনি যতবারই খেলেন, ততবারই পরাজিত হইতে লাগিলেন। পাশা খেলায় মানুষকে একবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলে। ধর্ম্মরাজ প্রতিবারেই মনে করিতে লাগিলেন এইবার পণ রাখিয়া মন্দ ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া লইব। কিন্তু হায়! এদিকে ভিতরে ভিতরে যে ছল চাতুর্য্য চলিতেছে, তাহা তিনি ভাগ্যদোষে কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহার নষ্ট ভাগ্যও তিনি পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে সক্ষম হইলেন না। ক্রমে রাজ্য, ধন, হয়, হস্তি, রথ সমস্তই পরাজিত হইলেন। এখন তাঁহার এক কপর্দ্দকও নাই। তিনি এখন পথের ভিখারী! তখন বিজয়োল্লাসে পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন বিকট হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, মহারাজ! এখন আর আপনার কি আছে, যে পণ রাখিবেন? এইবার আপনার দ্রৌপদী সুন্দরীকে পণ রাখুন। ধর্ম্মরাজ উপর্য্যুপোরি পরাজিত হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। আবার দুর্য্যোধনের এই শ্লেষবাক্যে ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। পুনরায় খেলা আরম্ভ হইল। এবারেও তিনি পূর্ব্বের স্থায় পরাজিত হইলেন। ধর্ম্মরাজের সৌভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্দ্ধ্যান হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহলক্ষ্মীকেও হারাইলেন। রাজাধিরাজ হইতে একবারে পথের ভিখারী! রাজ্য, ধন, সকলই গিয়াছিল, তাহাতেও তিনি বিচলিত হন নাই, কিন্তু প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন দ্রৌপদীকে হারাইয়াই তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রশান্ত সাগরে যেন উত্তাল তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল! হৃদয়াকাশে তুমুল ঝটিকা উঠিল! তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

এই সময় কুরুকুল-কলঙ্ক দুর্য্যোধন আবার বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন ভাই দুঃশাসন, এইবার অন্তঃপুরে যাইয়া দ্রৌপদীকে সভাস্থলে আনিয়া আমার অঙ্কশোভিনী কর! পাপিষ্ঠের ভ্রাতা পাপিষ্ঠ দুঃশাসন, ভ্রাতৃ

আজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদীকে আনয়ন করিবার জন্য অন্তঃপুরে ছুটিল। তথায় পৌঁছিয়া দ্রুপদ তনয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল, রাজার আজ্ঞায় তোমাকে এখনি সভাস্থলে যাইতে হইবে। সতীলক্ষ্মী এই কথা শুনিয়া একবারে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি এই কথার কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। দুঃশাসন ছাড়িবার পাত্র নয়। বলিল, এখনি চল, নতুবা তোমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইব। এই বলিয়া গাত্র স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। দ্রৌপদীদেবী সেই সময় রজঃস্বলা অবস্থায় ছিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ পিছাইয়া আসিয়া বলিলেন, দেবর! আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি অশুচি, আমাকে স্পর্শ করিলে তোমাতে পাপ অর্শাইবে। যে স্বয়ং পাপ সে কি কখন পাপকে ভয় করে? দুঃশাসন বলিল, আমি ওসব কথা শুনিনা, তোমাকে এখনি যাইতে হইবে; নতুবা আমি জোর করিয়া লইয়া যাইব। এই বলিয়া হস্ত ধারণ করিতে অগ্রসর হইল। দ্রৌপদী সজল নয়নে কর জোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন দেবর! পায়ে ধরি, ক্ষমা কর,—ক্ষমা কর,—এমন কাজ করিও না। কে কার কথা শুনে? পাপিষ্ঠ দুঃশাসন দ্রুপদ তনয়ার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সজোরে সভাস্থলে লইয়া চলিল! দ্রৌপদীর সকরুণ ক্রন্দনে, রক্ষা কর! রক্ষা কর! ছাড়, ছাড় শব্দে রাজপুরী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দুঃশাসন সকলই উপেক্ষা করিয়া পাঞ্চাল নন্দিনীকে সভাস্থলে আনয়ন করিল। তখন দুর্য্যোধন সহাস্যে বলিল, এইবার পাঞ্চালীকে আমার অঙ্কেতে বসাইয়া, অঙ্কের শোভা সম্পাদন কর। দুঃশাসন সতীলক্ষ্মীকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, তিনিও প্রাণপণ যত্নে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাপিষ্ঠ বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার কেশাকর্ষণ করিতে লাগিল। এই প্রকার টানা হেঁচড়াতে কেশ সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল। এইরূপ পৈশাচিক অভিনয় সভামধ্যে কিছুক্ষণ চলিল। তখন দুর্য্যোধন ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, দুঃশাসন! পাঞ্চালী যখন সহজে আসিতেছে না, তখন উহাকে উলাঙ্গিনী করিয়া আমার অঙ্কশোভিনী কর। এই পৈশাচিক আজ্ঞায় সভার সমস্ত লোক ঘৃণায়, লজ্জায় স্তব্ধ ও মৃয়মাণ হইলেন। তখন পাঞ্চাল নন্দিনী করজোড়ে সজল নয়নে সভাস্থ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি

সব মহারথীগণ এই সভায় উপস্থিত আছেন, আমি করজোড়ে আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে এই অমানুষিক অত্যাচার ও নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করুন। একজন নারীর উপর এত অত্যাচার হইতেছে, আপনারা বীরাগ্রগণ্য হইয়া এই সকল দেখিতেছেন? আমাকে রক্ষা করুন। কিন্তু পাপের মূর্ত্তিমান অবতার দুর্য্যোধনের ভয়ে কেহই একটী কথা বলিতে সাহসী হইল না। সকলেই নির্ব্বাক্ ও নিস্তব্ধভাবে নতশির হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহারা মনে মনে ভাবিলেন, এইবার কলির আগমন হইয়াছে, নচেৎ এরূপ পাপের অভিনয় রাজ সভায় কেন হইবে? তখন পদদলিতা ফণীনীর ন্যায় সতীলক্ষ্মী ঘৃণায় লজ্জায় সতীতেজে বলিয়া উঠিলেন, হা ধিক্! শতধিক্! তোমাদের রথী নামে ধিক্! তোমরা একজন নারীকে দুরাত্মার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলে না? ধিক্! তোমাদের রথীনামে ধিক্!

পাঞ্চালীর পঞ্চস্বামী, পঞ্চতত্ত্বের মূর্ত্তিমান অবতারস্বরূপ সেই সভাতে উপস্থিত আছেন। একা ভীমই সভার সমস্ত লোকদের যমালয়ে পাঠাইতে পারেন, আর অর্জ্জুনের তো কথাই নাই। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? তাঁহারা ধর্ম্মরাজের ভ্রাতা। এক একজন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুমতি ব্যতীত কোন কাজই করেন না। জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহাদের পথের ভিখারী করিয়াছেন, করুন, তাহাতে তাঁহারা একটী কথাও বলেন নাই। দ্রৌপদীর সভাস্থলে অমানুষিক নির্য্যাতন হইতেছে, হউক, ক্ষতি নাই। পৃথিবী রসাতলে যায়, যাউক, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁহারা ভ্রাতৃ ও মাতৃ আজ্ঞা ব্যতীত কখন কোন কাজ করেন নাই, এবং করিবেন না। তাহাতে যাহা হয় হউক।

যখন কেহই কোন কথা কহিলেন না, তখন পাঞ্চালনন্দিনী করজোড়ে সজলনয়নে পঞ্চপাণ্ডবদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, স্বামিন্! আপনাদের সহধর্ম্মিণীকে এই লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করুন। যদি আমার অজ্ঞানকৃত কোন অপরাধবশতঃ আমাকে রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হন, তবে একজন বিপদগ্রস্থা রমণী ভাবিয়াও আমাকে রক্ষা করুন। কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কিন্তু ভীমের দেহ ক্রোধে স্ফীত হইয়া উঠিল। চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। ক্রোধে অর্জ্জুনের দেহ থরথর করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। ভীম জ্যেষ্ঠভ্রাতার পানে চাহিয়া

অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সভার সমস্ত লোক ভাবিলেন, এইবার প্রলয় উপস্থিত। অর্জ্জুনও জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট সবিনয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সভার মহা মহা রথীগণ প্রাণভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। ভাবিলেন. আর কাহারও রক্ষা নাই। এই দুই ভাই রাগিলে সভার লোক কেহই জীবিত থাকিবে না। সভা এবং রাজবাটী পর্য্যন্ত সমভূম করিয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহা হইল না। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতাদিগকে সম্বোধন করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, ভাই ক্রোধ পরিত্যাগ কর, আমরা এখন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পথের কাঙ্গাল হইয়াছি, আমাদের কি এখন ক্রোধ শোভা পায়? যেখানে ধর্ম্ম সেইখানে জয়। আর যেখানে অধর্ম্ম, অত্যাচার ও ব্যাভিচার, সেইখানে পতন নিশ্চিত! ধর্ম্মরূপী নারায়ণ সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছেন, তিনি সকলই দেখিতেছেন। তোমাদের কিছু করিতে হইবে না, তাঁহার কার্য্য তিনিই করিবেন। তোমরা এই পৈশাচিক অভিনয়ের শেষ অঙ্ক এখনও দেখ নাই। স্থির হইয়া ইহার শেষ অভিনয় পর্য্যন্ত দেখ, উতলা হইও না। যখন পাঞ্চালী পঞ্চপাণ্ডবকেও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলেন, তখন সেই স্খলিতবসনা, এলাইতকেশা, অশ্রুপূর্ণনয়না পাঞ্চালী করজোড়ে বলিয়া উঠিলেন মাতঃ বসুন্ধরে! মা ভারতলক্ষ্মী! বিদীর্ণা হও আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করিয়া এই নির্য্যাতনের দায় হইতে মুক্তিলাভ করি! হায়! আমার পঞ্চ স্বামীও আমাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না? তবে কি জগতে আর কেহ নাই যে আমাকে রক্ষা করে? শুনিয়াছি, বিপদে মধুসূদন! তাঁহাকে একবার ডাকিয়া দেখি। এই বলিয়া দ্রুপদনন্দিনী করজোড়ে সজল নয়নে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন কোথায় জগৎপতি! মথুরাপতি, মথুরেশ! তুমি কোথায় প্রভু? একবার আসিয়া আমাকে রক্ষা কর! দীননাথ! দীনবন্ধু! এই অসহায়া নারীর তুমি ব্যতীত যে আর কেহ নাই! এস দর্পহারী মধুসূদন, এস একবার এস! দয়াময় আমি লাঞ্ছিতা হই তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রভু! তোমার দর্পহারী নামে যে কলঙ্ক পড়িবে তাহা অসহনীয়! দয়াময়! একবার আসিয়া নারীর লজ্জা নিবারণ কর! দ্রৌপদীরূপা প্রকৃতির (নারীমূর্ত্তিই প্রকৃতির ব্যক্ত মূর্ত্তি) সকরুণ আহ্বানে; ভক্তের আহ্বানে পরমপুরুষ ভক্তবৎসল ভগবান কি আর থাকিতে পারেন? তিনি তখনি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আসিয়া

পাঞ্চালীর কুটস্থে প্রকাশিত হইলেন। চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বক্ষে কৌস্তুভমণি শোভিত! অপরূপ মূর্ত্তি! বিশ্বরূপ দর্শন ভীত অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই মূর্ত্তি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিকেই পুরুষোত্তম মূর্ত্তি বলে। সাধক ষট্‌চক্রের ক্রিয়াদ্বারা নিজ দেহেই এই মূর্ত্তি দেখিতে পান। ইহা কল্পনার বিষয় নয়। এই মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে যে সাধক তন্ময় হইয়া তাহাতে লীন হইয়া যাইতে পারেন তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহাই মুক্তিপদ। এ অবস্থা হইতে আর নামিয়া আসিতে হয় না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

গীতা ১৫শ অঃ ৬ শঃ।

অর্থাৎ যোগী যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে আবর্ত্তন করেন না, সেই পদকে চন্দ্রসূর্য্যাও অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না, সেই আমার পরম ধাম, অর্থাৎ স্বরূপ।

পূর্ব্বে যে ষট্‌চক্রের কথা বলা হইল, তাহা আমাদের জানা উচিত। মনুষ্যদেহে ছয়টি চক্র বা পদ্ম আছে। সেই ছয়টি পদ্ম মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া দেহের মধ্যে নিম্নমুখী হইয়া রহিয়াছে। এই ছয় পদ্মে ছয় ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান, যথা শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য, জ্ঞান, ও বিজ্ঞান। যোগক্রিয়ার কৌশলদ্বারা সাধককে এই সকল পদ্মকে ঊর্দ্ধমুখী করিয়া তাহাদের দৈবী শক্তি উদ্ধার করিতে হয়। যে সাধক তাহাতে কৃতকার্য্য হন, তিনি ঐ সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, পুরুষ হইলে ভগবান, আর নারী হইলে ভগবতী পদবাচ্য হন। ভগ্ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য, যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রকৃতিদেবীতেই এই সকল ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান, তাই তাঁহাকে পরাশক্তি ভগবতী বলা যায়। আর যাঁহা হইতে পরাশক্তির উৎপত্তি তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান। ভাগ্যবান সাধক যখন সদ্‌গুরু কথিত যোগকৌশলদ্বারা ষট্‌চক্র বা ষট্‌পদ্ম ভেদ করিয়া দ্বিদল পদ্মে স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হন, তখনই তিনি পুরুষোত্তম মূর্ত্তি 'দর্শন করিবার উপযুক্ত হন, নচেৎ নয়।

পাঞ্চালনন্দিনীর সকরুণ আহ্বানে ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার কুটস্থে

প্রকাশিত হইলেন। বস্তুতঃ তাঁহার অপ্রকাশ কোথাও নাই, তিনি সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রকাশমান হইয়া রহিয়াছেন। আমাদের চক্ষু নাই, জ্ঞানও নাই সুতরাং আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। গুরুই সেই চক্ষু দান করেন। সাধারণ গুরু ব্যবসায়ী গুরু নয়। সে গুরু দুর্লভ, অনেক পুণ্যফলে তবে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। যিনি পরমাত্মার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি শিষ্যের দেহমধ্যে দেখাইয়া তাহার অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করিতে পারেন, তিনিই গুরু পদবাচ্য। আর কেহ গুরুপদবাচ্য হইবার যোগ্য নহে। 'গু' শব্দে অন্ধকার, 'রু' শব্দে আলো। যিনি শিষ্যকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। গুরু গীতায় গুরুর বর্ণনা এই যথা:—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অর্থাৎ যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকাদ্বারা অজ্ঞানরূপ তিমির নাশ করিয়া চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন, তিনিই গুরু, তাঁহাকে নমস্কার করি।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রধান ভক্ত ও সখা, তথাপি এতাবৎকাল কখন তাঁহার স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পান নাই। যখন শ্রীকৃষ্ণের স্তব স্তুতি করিয়া বলিলেন,—

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মান মব্যয়ম্॥

গীতা ১১ম অঃ, ৪ শঃ।

অর্থাৎ হে প্রভো, যদি আমি তোমার সেইরূপ দেখিতে পারি, এরূপ মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর, তুমি আমাকে সেই অব্যয় আত্মা দেখাও। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন:—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥

গীতা ১১ অঃ ৮ শঃ।

অর্থাৎ তুমি এই স্বীয় চক্ষুদ্বারা আমাকে দেখিতে পাইবে না। অতএব তোমায় (দিব্য-জ্ঞানময়) চক্ষু দিতেছি, আমার অসাধারণ যোগ দেখ।

অর্জ্জুন সেই দিব্যজ্ঞানময় চক্ষু পাইয়া তবে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন অত্যন্ত ভীত হইয়া ভগবানের মানুষ মূর্ত্তি, অর্থাৎ পুরুষোত্তম মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। শ্রীভগবান অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে সেই দেবদুর্লভ পুরুষোত্তম মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন।

প্রকৃতিরূপা দ্রৌপদীর আহ্বানে শ্রীভগবান পুরুষোত্তম মূর্ত্তিতে আসিয়া তাঁহার কূটস্থে প্রকাশিত হইয়া অন্তর্যামীরূপে মধুর বচনে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যাজ্ঞসেনী! এই যে আমি এসেছি, তোমার কোন ভয় নাই! দ্রৌপদী সেই অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভাবে বিমোহিত হইয়া, অন্তর্যামীকে সম্বোধন করিয়া অন্তরে অন্তরেই বলিলেন, প্রভো! এত বিলম্ব কেন? দুরাত্মা দুর্য্যোধন সভামধ্যে যে আমাকে বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছে! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সখী আমি সর্ব্বদাই তোমার কূটস্থমধ্যে বিরাজ করিতেছি। কূটস্থ দর্শন করিলেই আমাকে দেখিতে পাইতে। বস্তুতঃ পরমাত্মা সকল জীবেরই কূটস্থ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য কোন চেষ্টাই করি না, ফলে আমাদের জন্ম মৃত্যু কেবলই ঘুরিয়া ফিরিয়া হইতেছে। জন্ম মৃত্যুরও বিরাম নাই, আমাদের দুঃখ শোকেরও অন্ত নাই। আর দুঃখই যে কাহাকে বলে, তাহারও প্রকৃত জ্ঞান নাই। আমরা মনে করি আমাদের আহার বিহার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিলেই, আর রোগ ভোগ না থাকিলেই আমাদের সুখ, আর ইহার কোন ব্যাঘাত হইলেই দুঃখ। বস্তুতঃ এ ধারণা আমাদের ঠিক নয়। দুঃখ শব্দের অর্থ এই, 'দুঃ' অর্থে দূরে, আর 'খং' অর্থে ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে দূরে থাকাই দুঃখ। আর যাহাদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিকট হয়, তাহাই সুখ। অনন্ত বাসনামালায় জড়িত হইয়া, অনন্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তথাপি যাহা পাইলে, ইহকাল ও পরকালে আমরা অনন্ত সুখলাভ করিতে পারিব, আমরা তাহার জন্য একটুও চেষ্টা করি না।

কেহ কেহ বলেন, পরজন্মও নাই, পরকালও নাই। যাহা কিছু ভোগ সব এই জন্মেই শেষ। এ কথার উত্তরে আমরা বলিব, শাস্ত্রই আমাদের প্রমাণ। শাস্ত্র সকল অভ্রান্ত। আমরা যখন শাস্ত্র মানিয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকি, তখন এ কথাও না মানিব কেন? শঙ্করাচার্য্য একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন তিনি বলিয়াছেন,—

যাবজ্জননং তাবন্মরণং।
তাবজ্জননী জঠরে শয়নম্‌॥
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ।
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥

এইতো একজন সিদ্ধপুরুষের কথা। আর তাহাও যদি আমরা না বিশ্বাস করি তবে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতো আমাদের বিশ্বাস করা উচিত, তাহা এই:—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদ পরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতু মর্হসি॥

গীতা ২য় অঃ ২৭ শঃ।

অর্থাৎ জন্ম হইলেই মৃত্যু ধ্রুব নিশ্চিত আর মৃত্যু হইলেই জন্ম ধ্রুব নিশ্চিত। অতএব তুমি তাহার জন্য শোক করিও না।

স্বয়ং ভগবান যখন এই কথা বলিয়াছেন, তখন যে পুনর্জ্জন্ম আছে, সে বিষয়ে আর কোন সংশয়ই নাই। অতএব লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ ও বিষ্ঠামূত্রে বাস করা অপেক্ষা, যাহাতে আর যোনিভ্রমণ না করিতে হয় তাহাই করা উচিত। তাহা হইলে এই নরক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। কারণ ইহাই নরক, ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় নরক আর কোথাও নাই। মনুষ্য জন্ম দুর্লভ জন্ম। দেবতারাও যাহা লাভ করিতে পারেন না, মনুষ্য সাধনবলে তাহা লাভ করিতে পারে।

সে যাহা হউক, তাহার পর দর্পহারী মধুসূদন বলিলেন, সতীলক্ষ্মী, তোমাকে বিবস্ত্রা করিতে পারে এমন জীবতো অদ্যাবধি ত্রিলোকে জন্ম গ্রহণ করে নাই। তুমি নিশ্চিন্তা থাক কেহই তোমাকে বিবস্ত্রা করিতে পারিবে না। যাঁহারা এই পৈশাচিক কার্য্য করিতে তৎপর হইয়াছেন, তাঁহাদের ধ্বংস নিশ্চিত, এবং তাঁহাদের বংশধরগণেরও অধঃপতন নিশ্চিত হইল। তাহারা অবনতির চরম সীমায় যাইবে। আজ প্রকৃতির নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা করা হইল, যদি কখন তাহারা প্রকৃতির উপাসনা করিয়া তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারে তবেই তাহাদের আবার মঙ্গল হইবে, নচেৎ চিরকাল তাহাদের দুঃখ শোক ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার অভয়বাণী শুনিয়া যাজ্ঞসেনী সেই পুরুষোত্তম মূর্ত্তি তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিলেন, আর দেখিতে

দেখিতে ভাবে বিমোহিত হইয়া, অর্থাৎ আত্মহারা হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

দুঃশাসন বিবস্ত্রা করিতে নিরস্ত হইল না। দ্রুপদনন্দিনীও এখন আর কোন বাধা দিলেন না। আর কে বাধা দিবে? তাঁহার জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। জগতের অস্তিত্ব তাঁহার কাছে লোপ হইয়া গিয়াছে, তিনি পঞ্চ তত্ত্বের অতীত স্থানে যাইয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার আত্মা তত্ত্বাতীত নীরঞ্জনের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, বাধা দিবার আর কেহ নাই। দুঃশাসন বস্ত্র ধরিয়া টানিয়া লইল, বস্ত্র খুলিয়া আসিল, কিন্তু সতীলক্ষ্মী উলঙ্গিনী হইলেন না, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আর একখানি বস্ত্র লাগিয়া আছে! দুঃশাসন আবার টানিল, আবার দেখিল সেই শ্রীঅঙ্গে আর একখানি বস্ত্র লাগিয়া আছে! এইরূপ যতবার টানিল, প্রতিবারেই দেখিল শ্রীঅঙ্গে একখানি বস্ত্র বিজড়িত আছে! এইরূপ বস্ত্র টানিতে টানিতে সভামধ্যে বস্ত্রের স্তুপাকার হইল! সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। সকলেই বুঝিলেন সতীকে কোন দৈবশক্তি রক্ষা করিতেছে।

এইখানে ঠিক যেন হনুমানের লঙ্কা দগ্ধের পালা আরম্ভ হইল। রাবণরাজা তাঁহার পারিষদবর্গকে হুকুম দিলেন যে হনুমানের লাঙ্গুলে বস্ত্র জড়াইয়া অগ্নি জ্বালিয়া দিয়া উহাকে দগ্ধ কর। পারিষদবর্গ তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু লাঙ্গুলে যতই বস্ত্র জড়াইতে লাগিল তাহার আর শেষ হয় না, দুই অঙ্গুলি অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। লঙ্কায় যত বস্ত্র ছিল প্রায় সমস্ত আনাইয়া লাঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল, কিন্তু সেই দুই অঙ্গুলি আর পূরণ হইল না! হনুমান বাবাজি চুপ করিয়া বসিয়া মজা দেখিতেছেন। যতই বস্ত্র জড়ান হইতেছে, রসিক হনুমানজি তাঁহার সখের লেজটীকে দুই অঙ্গুলি বাড়াইতেছেন! সুতরাং লঙ্কার বস্ত্রে আর কুলান হইল না। রাবণরাজা ভাবিলেন বেটা হনুমান বুঝি মন্ত্র তন্ত্র জানে, আচ্ছা উহার ঐ মন্ত্র তন্ত্রের দেহরূপ ঝুলিটা এখনি দগ্ধ হবে, এই অবস্থাতেই আগুন লাগাইয়া দিতে বলি, তাহা হইলেই মন্ত্র তন্ত্র সমেত একেবারে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তাহা হইলেই সব গণ্ডগোল মিটে যাবে। এই ভাবিয়া ক্রোধে বিংশতি চক্ষু (দশটা মাথায় কুড়িটা চক্ষু) আরক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন দাও ঐ অবস্থাতেই অগ্নি প্রদান কর। তাহাই করা হইল। ফলে হনুমান দগ্ধ না হইয়া লঙ্কা দগ্ধ হইতে লাগিল! ইহাও প্রায় সেই প্রকার। দুর্য্যোধন

যখন দেখিল যে পাঞ্চালীকে উলঙ্গ করা তাঁহার সাধ্যের অতীত—তখন বুঝিলেন দ্রুপদ তনয়াকে কোন দৈবশক্তি রক্ষা করিতেছে, তাঁহার রাক্ষস বলে আর কুলাইবে না। এইবার পাষাণ হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। মনে মনে ভাবিলেন এইবার তাঁহার বিপদ উপস্থিত। এই ভয়ে বলিলেন, দাও উহাকে ছাড়িয়া দাও, আর বল প্রয়োগের আবশ্যক নাই। কিন্তু এখন ছাড়িয়া দিলেই বা যায় কে? যিনি যাইবেন তিনি সেই অনির্ব্বচনীয় রূপ দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া আছেন। বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। তখন দুর্য্যোধন বলিলেন, যাও উহাকে অন্তঃপুরে রাখিয়া আইস। তখন দুঃশাসন পাঞ্চালীকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল, কিন্তু এবারে আর বলপূর্ব্বক কেশাকর্ষণ করিয়া নয়, ভয়ে তাঁহাকে ধীরে ধীরে লইয়া গেল। এইবার অর্জ্জুন মনে মনে ভাবিলেন, আমার দাদাটী ভিজে বিড়াল, ভয়ে কোন কথাই কহিতে চাহেন না, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে দুরাত্মা দুর্য্যোধন যখন পাণ্ডবপত্নী পাঞ্চালীকে সভা মধ্যে উলাঙ্গিনী করিতে বাঞ্ছা করিয়াছে, আর যখন সভায় একটি প্রাণীও তাহাতে কোন কথা কহিতে সাহসী হয় নাই, তখন একদিন এই সভার সমস্ত লোককে এককালিন বিবস্ত্র করিব, এই আমার প্রতিজ্ঞা, ইহা কিছুতেই অন্যথা হইবে না। ভীমও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন যখন আমাদিগের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভার্য্যাকে উরু শোভিনী করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে একদিন আমার এই গদাঘাতে তাহার উরু চূর্ণ বিচূর্ণ করিব, আমার এই প্রতিজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন হইবে না।

দুঃশাসন পাঞ্চালীকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সভার সকলেই সেই পৈশাচিক আড়ম্বর দেখিয়া মৃয়মান হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে দ্রৌপদীকে দৈবশক্তি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত ও ভীত হইলেন। দুর্য্যোধন এখন বুঝিয়াছেন যে দ্রৌপদীকে নির্য্যাতন করিবার জন্য তিনি ব্যভিচারের অসীম সীমায় গিয়াছিলেন, এখন তাঁহার বিপদ অনিবার্য্য। তাঁহার মুখে কোন কথা নাই। তিনি দুশ্চিন্তার গুরুভারে ধীরে ধীরে সিংহাসন হইতে উঠিয়া সভাভঙ্গের ইঙ্গিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। এইবার সেই পৈশাচিক অভিনয়ের যবনিকা পতন হইল। সেইদিন প্রকৃতির লাঞ্ছনায় ভারতলক্ষ্মী ঘৃণায় ভারত হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন! সেই দিন হইতে ভারতের গৌরবরবি নবজলধর-পটলে ক্রমে আবৃত হইতে আরম্ভ

হইল। সেইদিন কুরুবংশের ধ্বংসের বীজ বপন করা হইল। আর সেই দিন হিন্দু জাতির পতন নিশ্চিত হইল। ভগবান পাপীর অনেক অত্যাচার সহ্য করেন, কিন্তু প্রকৃতিরূপা নারীর উপর অযথা অত্যাচার কখন সহ্য করেন না। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রতিফল দিয়া থাকেন। ত্রেতা-যুগে রাবণ সীতার প্রতি অত্যাচার করিয়া সবংশে ধ্বংস হইয়াছিল। আর দ্বাপর যুগে দ্রৌপদীর উপর অত্যাচার করিয়া কুরুবংশ ধ্বংস হইল। কলি-যুগেও এরূপ ঘটনা বিরল নহে। তাহার উদাহরণ স্বরূপ দুই চারিটী ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

জগৎবিখ্যাত নেপোলিয়ান বোনাপার্টি, একান্ত পতিপ্রাণা প্রণয়িনী জোশেফাইনের উপর কোন প্রকার পাশবিক অত্যাচার করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহাকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত অবিচার ও অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই মহাপাপের অনতি পর হইতেই তাঁহার গৌরবরবি ধীরে ধীরে অস্তমিত হইয়া, দুঃখ শোক ও অপমানের অন্তিমতম সীমায় নিক্ষেপ করিল। তাঁহার উন্নতি যেমন অলৌকিক অবনতিও তদ্রূপ অলৌকিক। এরূপ ঘটনা জগতে আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। ইংরাজজাতি প্রকৃতিরূপা নারীর সম্মান করিতে বেশ জানেন। কিন্তু ইদানীং ধন ও গৌরবমদে মত্ত হইয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, স্থানে স্থানে নারীর উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। স্বদেশে তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীরা কর্ত্তৃপক্ষদের শাসনে অসন্তুষ্ট ও চঞ্চল হইয়া সাফ্রাগেট নামক দলের সৃষ্টি করিলেন; তাঁহাদের দমন করিবার জন্য শাসনকর্ত্তারা যারপরনাই অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। অন্য অন্য স্থানেও নারীর উপর নানাপ্রকার অত্যাচার অবিচার চলিতে লাগিল। এই সময়েতেই জার্ম্মাণ জাতির সহিত ইংরাজদের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে ইংরাজদের অসংখ্য লোকক্ষয় হইল এবং তাঁহাদের গৌরবরবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইবার উপক্রম হইল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের নারীর উপর অত্যাচার তত গুরুতর নয় বলিয়া এমন একটী ঘটনা ঘটিল যাহাতে ইংরাজের বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাদের কাছেই পুনরাগমন করিলেন। যুদ্ধকালীন জার্ম্মাণ সম্রাট একজন ইংরাজ মিসনারি মিসকে গুপ্তচর বলিয়া বন্দিনী করিলেন। এবং বিচার করিয়া সেই মিসনারি রমণীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করিলেন। এই রমণীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রহিত করিবার জন্য নানা দেশের গণ্যমান্য এবং সম্ভ্রান্ত লোক সকল সম্রাটকে উপরোধ অনুরোধ

করিয়াছিলেন, কিন্তু জার্ম্মাণ সম্রাট জয়োল্লাসে স্ফীত হইয়া কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া সৈন্যমণ্ডলীর সম্মুখে সেই মিসানারি মিস্ রমণীকে হত্যা করাইলেন। সেই পাপে ইংরাজদেরই হস্তে সম্রাট পরাজিত, লাঞ্ছিত, রাজ্যভ্রষ্ট, অবশেষে প্রাণ লইয়া অপর একদেশে যাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। এ সকলই নারীর উপর অত্যাচারের ফল। রুসিয়া রাজের অনেক অত্যাচার ছিল, তাহা সত্ত্বেও তাহার রাজত্ব অটুট ছিল। কিন্তু যেদিন বল্‌সেভিকগণ রাজা, রাণী এবং নিরীহ রাজকন্যাদিগকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করিল, তাহার পরেই সেই বিশাল রুসিয়া সাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া অরাজকতায় পূর্ণ হইল। তুর্কির বাদ্‌সা বহুদিন যাবৎ নারীর উপর অত্যাচার করিয়া আসিতেছিলেন, এখন সে তুরস্ক রাজ্য কোথায়? চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া আর এক নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি আমাদের দেশে যে একটী ঘটনা হইল তাহাও নারীর উপর অত্যাচারের জলন্ত দৃষ্টান্ত। মমতাজ বেগমের উপর অমানুষিক অত্যাচার, বাউলা হত্যাকাণ্ড, আর দুইজন ইংরাজের অসম সাহাসিকতার পরিচয় এখনও কেহ ভুলে নাই। একজন বিদেশীয় রমণীকে রক্ষা করিবার জন্য দুইজন নিরস্ত্র ইংরাজ প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া দশ জন সশস্ত্র হত্যাকারীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মমতাজ বেগমকে রক্ষা করিয়াছিল এবং বাউলাকে হত্যা করিবার অপরাধে বিচারে সেই পাষণ্ডদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়াইয়া ক্ষান্ত হইয়াছিল। এবং যাঁহারা এই হত্যাকাণ্ডে গুপ্তভাবে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের আইন অনুসারে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে না পারায় অন্য প্রকার শাস্তি দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজ নারীর সম্মান সর্ব্বাগ্রে দান করিয়া থাকেন। নারীর বিপদ দেখিলে সে নারী যে কোন জাতি হউক না কেন, প্রাণ দিয়া তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন। যেখানে নারীর উপর অত্যাচার দেখেন, সেইখানে অত্যাচারীর সমুচিত প্রতিফল দিয়া থাকেন। সেইজন্য ইংরাজজাতির শৌর্য্য বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য আজ এত বৃদ্ধি হইয়াছে। কেবল ইংরাজজাতি কেন? ইয়োরোপের সকল জাতিই প্রকৃতি-রূপা নারীর সম্মান সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিয়া থাকেন। সেই জন্য ইয়োরোপ আজ এসিয়া অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে উন্নতশীল হইয়াছে। আমাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার মধ্যেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে পরিবার মধ্যে নারীর উপর পীড়ন ও অত্যাচার হয়, সেই পরিবারের মঙ্গল হয় না, শীঘ্রই দুর্দ্দশার চরম সীমায় আসিয়া পড়ে। আর যে পরিবার মধ্যে নারীর প্রতি

মায়া, মমতা ও সম্মান আছে, সে পরিবার যদিও অত্যন্ত দুঃখী হয় তথাপি সেই পরিবার মধ্যে সদাই শান্তি বিরাজ করিতে দেখা যায়। ইহার ভুরী ভুরী প্রমাণ আছে।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাঁহারা রাজরাজেশ্বর ছিলেন, তাঁহারা আজ পথের ভিখারী হইলেন! ভগবানের বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে? পঞ্চ পাণ্ডব দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনবাসী হইলেন, আর এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিবেন। তাঁহারা দ্রৌপদীকে লইয়া দীনবেশে সজল-নয়নে রাজবাটী পরিত্যাগ করিলেন। রাজপরিবার ও প্রজাবৃন্দ হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও হস্তিনাপুর হইতে পলায়ন করিলেন। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী নানাপ্রকার কষ্টভোগ করিয়া দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিলেন। শেষে এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিলেন।

এই সময় ভগবান অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার একটী সুন্দর অবসর দিলেন। দুর্য্যোধন ধনমদে মত্ত হইয়া কোন সম্বাদ রাখিতেন না। ত্রয়োদশ বৎসর কোন্ দিন যে শেষ হইবে তাহা তিনি জানিতেন না। ত্রয়োদশ বৎসরের শেষ দিন তিনি বিরাট রাজের গোগৃহ হরণ করিবার মনস্থ করিয়া সৈন্য সামন্ত ও সভাসদবর্গকে লইয়া বিরাট রাজ্য আক্রমণ করিলেন। বিরাট রাজ্য অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। কুরুরাজ দুর্য্যোধনের নাম শুনিয়া বিরাটরাজ ভয়ে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া বিরাটরাজের সহচর কঙ্কবেশধারী ধর্ম্মরাজ, তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, ভয় কি মহারাজ আপনার বৃহন্নলা নৃত্য গীত বিদ্যায় যেরূপ পারদর্শী, সমর বিদ্যায় তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক পারদর্শী। আপনি যুবরাজকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে, আর বৃহন্নলাকে তাঁহার সারথির পদে বরণ করুন। বৃহন্নলা যুবরাজের সারথি হইলে যুবরাজ সমরে অজেয় হইবেন, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। বিরাটরাজ কঙ্ক-বেশধারী ধর্ম্মরাজের উপদেশ মত যুবরাজকে সৈন্যাধ্যক্ষ আর বৃহন্নলা বেশধারী অর্জ্জুনকে সারথির পদে বরণ করিলেন। পরে সৈন্যসামন্ত লইয়া উভয়ে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তথায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন গাণ্ডীব হস্তে লইয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহা মহা রথীকে পরাজিত করিলেন। অবশেষে সংমোহন বাণ দ্বারা সকলের চৈতন্য হরণ করিয়া বিরাট পুত্রকে বলিলেন, রাজকুমার তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছ,

শত্রুপক্ষীয় সকলেই বাণাঘাতে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই অবসরে তুমি রণক্ষেত্রে যাইয়া উহাদিগকে উলঙ্গ করিয়া মূল্যবান পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত কাড়িয়া লইয়া আইস। ঐ সকল পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার রাজকন্যা-দিগকে খেলিবার জন্য উপহার দেওয়া যাইবে, তাঁহারা ঐ সকল পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইবেন। আর মহারাজও দেখিয়া তোমার সামর্থের ভূয়সী প্রশংসা করিবেন। আর শত্রুরাও তাঁহাদের দিগম্বর বেশ দেখিয়া বুঝিবেন যে তাঁহাদের পরাজয়ের চূড়ান্ত হইয়াছে। রাজকুমার অর্জ্জুনের আদেশ মত শত্রুদের সমস্ত পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার প্রভৃতি লইয়া আসিলেন। পরে সেই সকল রথে বোঝাই করিয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কুরুরাজ তাঁহার সভাসদ্‌বর্গ ও সৈন্যসামন্তের সহিত রণস্থলে দিগম্বর বেশে পড়িয়া রহিলেন। যখন তাঁহাদের চৈতন্য হইল তখন তাঁহারা নিজ নিজ অবস্থা দেখিয়া ঘৃণায় লজ্জায় মৃয়মান হইয়া রহিলেন। তাঁহারা মনে মনে বুঝিলেন যে তাঁহাদের পরাজয়ের চূড়ান্ত, অর্থাৎ পেজ পয়জার দুইই হইয়াছে। ত্রয়োদশ বৎসরের শেষ দিন অর্জ্জুন তাঁহার প্রতিজ্ঞা এইরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন।

বিরাটরাজ ইতিপূর্ব্বেই যুদ্ধজয়ের সংবাদ দূতমুখে শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজকুমার বৃহন্নলার সহিত নগরে প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সভাসদ্‌বর্গের সহিত প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ক্রমে রাজকুমার বৃহন্নলাকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রাজকুমারকে বক্ষে ধারণ করিয়া শির চুম্বন করিলেন, এবং রাজকুমারের ও বৃহন্নলার সামর্থের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। রাজকুমার ও বৃহন্নলা উভয়ে রাজাকে অভিবাদন করিলেন। সভাসদ্‌বর্গ সকলেই উভয়ের যারপরনাই সুখ্যাতি করিলেন। রাজা নগরে উৎসব হইবার আজ্ঞা প্রচার করিয়া সভাভঙ্গের আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে আনন্দে প্রবেশ করিলেন। প্রজাবৃন্দ আনন্দে অধীর হইয়া উৎসবে যোগদান করিল। এইরূপে সেইদিন আনন্দে অতিবাহিত হইল। রাত্রে উৎসবের কোলাহল ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল। পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিশ্রামলাভের জন্য আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন। রাজপরিবারবর্গ ও কর্ম্মচারীগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অচিরে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। রাজবাটী নিস্তব্ধ হইল। নিশীথকালে যখন সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন,

সেই সময় পঞ্চপাণ্ডব নিভৃতে একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিলেন যে আমাদের ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, আর আমাদের আত্ম গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। কল্যই আমরা আত্ম প্রকাশ করিব। কিরূপে আত্ম প্রকাশ করা হইবে, তাহার পরামর্শ স্থির করিয়া তাঁহারা তাহার উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজসভা রক্ষক অতি প্রত্যূষে সভাস্থল পরিষ্কার করাইতে আসিয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন কঙ্ক রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন, বামে সৈরিন্ধ্রী, পাচক কঙ্কের শিরোপরি রাজছত্র ধারণ করিয়া পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছেন। বৃহন্নলা চামর ব্যজন করিতেছেন আর নকুল ও সহদেব আশা ও দণ্ড ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সভারক্ষক এই ব্যাপার দেখিয়া একবারে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না; তিনি রাজাকে এই সংবাদ দিবার জন্য দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। রাজা সম্বাদ পাইবামাত্র দ্রুতপদে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, এঁ্যা একি? কঙ্ক তুমি আমার সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছ! তুমি কি আমার সিংহাসনে উপবেশন করিবার যোগ্য? ভীম ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন মহারাজ! আপনি ঠিক্ বলিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র সিংহাসন এই মহাত্মার যোগ্য নয়, কেবল অভাবে উহাতে বসিয়াছেন, শীঘ্রই ভারত সিংহাসনে উপবেশন করিবেন। রাজা উত্তর করিলেন, কেন? উনি কে যে ভারত সিংহাসনে উপবেশন করিতে আশা করেন? ভীম বলিলেন মহারাজ! আপনি শুনিবেন উনি কে? তবে শুনুন, উনি রাজাধিরাজ মহারাজ যুধিষ্ঠির, আর বামে পাঞ্চাল রাজনন্দিনী দ্রৌপদী, পাণ্ডব বধূ। আমার নাম ভীমসেন, আর চামরধারী মহাত্মা অর্জ্জুন, আর এই দুইটি আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মাদৃতনয় নকুল ও সহদেব। রাজা বলিলেন এঁ্যা! সত্য নাকি? ভীম বলিলেন মহারাজ! ইহা সত্য। আমাদের ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তাই অদ্য আমরা আত্ম প্রকাশ করিলাম। বিরাটরাজ এই কথা শুনিবামাত্র ধর্ম্মরাজকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! অদ্য আমার সিংহাসন পবিত্র হইল। আমার রাজ্য পবিত্র হইল। মহারাজ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হউক। আপনাকে আমার সহচর বোধে অজ্ঞানবশতঃ কত তিরস্কার করিয়াছি, কত অবজ্ঞা করিয়াছি, সেই সকল অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন; এই বলিয়া বিরাটরাজ করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ধর্ম্মরাজ

ঈষৎ হাস্য করিয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিরাটরাজকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি আমার কোন অপরাধ করেন নাই, আপনার গৃহে এক বৎসর কাল পরম সুখে অতিবাহিত করিয়াছি। সেই কারণে আমরা সকলে আপনার কাছে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ আছি, তাহা যে কেমন করিয়া পরিশোধ করিব তাহা বলিতে পারি না। আজ হইতে আপনাকে আমার পরম সুহৃদ ও সখা বলিয়া গণ্যমান্য করিব। আসুন আপনি সিংহাসনের দক্ষিণে উপবেশন করুন। এই বলিয়া বিরাট-রাজের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া গিয়া সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। এই সম্বাদ রাজবাটীতে প্রচার হইবার পর রাজবাটীর সকলে একে একে আসিয়া পঞ্চ পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীকে অভিবাদন করিলেন। সকলের অভিবাদন কার্য্য সমাপ্ত হইলে বিরাটরাজ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে আপনাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য আয়োজন করিতে অনুমতি দিন। ধর্ম্মরাজ বলিলেন মহারাজ! আমরা আপনার অতিথি, আপনি দেশের রাজা, আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহা করিতে পারেন, তাহাতে আমার অনুমতির আবশ্যক নাই। আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন তাহাই করুন। এইরূপ কথোপকথনের পর সভা ভঙ্গ করিয়া বিরাটরাজ পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদীকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। রাজপরিবার মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও রাজার অনুগমন করিলেন।

বিরাটরাজ অন্তঃপুরে যাইয়া মন্ত্রীকে ডাকাইয়া বলিলেন, মন্ত্রী মহাশয়, আপনি রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিন যে পঞ্চ পাণ্ডব, পাঞ্চাল রাজকুমারীর সহিত এই নগরে আগমন করিয়াছেন. তাঁহাদের প্রকাশ্যভাবে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কল্য হইতে সপ্তাহ কাল সভা হইবে, এইজন্য অধীন রাজাগণ, জমিদার, তালুকদার, রাজকর্ম্মচারীগণ ও প্রজা সকল একে একে আসিয়া তাঁহাদের অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন ইহাতে যেন অন্যথা না হয়। আর নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, সপ্তাহকাল উৎসব হইবে। আর প্রতি গৃহে মাঙ্গলিক চিহ্নস্বরূপ পূর্ণকুম্ভ, আম্রশাখা ও কদলীবৃক্ষ স্থাপন করিতে হইবে। এই সকল আজ্ঞা প্রচার করিয়া আপনি এক বিরাট সভার আয়োজন করিয়া সভাসদ্‌বর্গকে সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য আজ্ঞা দিবেন। মন্ত্রী মহাশয় যে আজ্ঞা বলিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবদিগের সেবার জন্য নানাপ্রকার আহারীয় দ্রব্যের আয়োজন হইতে লাগিল। পরে পাণ্ডবগণ স্নান ও আহ্নিক পূজা সমাপ্ত করিলে বিরাট রাজ পাণ্ডবদিগের কাছে যাইয়া তাঁহাদের আহ্বান করিয়া লইয়া আসিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে পর পৃথক পৃথক শয্যায় সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বিশ্রামের পর পুনরায় বিরাট রাজের সহিত মিলিত হইয়া নানাপ্রকার বাক্যালাপে ও আনন্দে সেদিন অতিবাহিত করিলেন।

বিচক্ষণ মন্ত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধারণে একটী সুন্দর সভাগৃহ নির্ম্মাণ করান হইয়াছে। বিরাটরাজ সভাগৃহ পরিদর্শন করিতে আসিয়া সভার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের কার্য্যকুশলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। পরে অন্তঃপুরে যাইয়া পাঞ্চালনন্দিনীকে ও পঞ্চ পাণ্ডবদিগকে রাজপরিচ্ছদে সজ্জিত করাইয়া এবং আপনিও রাজ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সকলে একত্রিত হইয়া সভাস্থলে আগমন করিলেন। সভাসদ্‌বর্গ দণ্ডায়মান হইয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন জয়! মহারাজ যুধিষ্ঠির জয়! জয়! মহারাজ বিরাটরাজের জয়! এই জয়, জয় শব্দে সভাস্থল কম্পিত হইয়া উঠিল। ধর্ম্মরাজ সভাসদ্‌বর্গের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্যে শির নত করিয়া সকলকে অভিবাদন করিলেন। পরে বিরাটরাজ ধর্ম্মরাজের ও দ্রৌপদীর কর ধারণ করিয়া উভয়কে সিংহাসনে বসাইলেন। ভীম আসিয়া ছত্র ধারণ করিলেন, অর্জ্জুন চামর হস্তে লইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। নকুল ও সহদেব আশা ও দণ্ড ধারণ করিয়া যথা-স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। ধর্ম্মরাজ বিরাট রাজের কর ধারণ করিয়া আপনার দক্ষিণে আর একখানি সিংহাসনে বসাইলেন। আবার, জয়! মহারাজ যুধিষ্ঠির জয়! জয়! মহারাজ বিরাটরাজের জয়! অমনি চারিদিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, অন্তঃপুর হইতে শঙ্খের ধ্বনি হইল। নহবতের মধুর ধ্বনি আরম্ভ হইল। সকলেই সিংহাসনের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মোহিত হইলেন। আনন্দের কোলাহল নিবৃত্ত হইলে বিরাটরাজ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সভার সভ্য ও দর্শকবৃন্দদিগকে উদ্দেশ করিয়া পাণ্ডবদিগের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন মহাত্মা পাণ্ডবগণ দয়া করিয়া আমার রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সেই জন্য প্রকাশ্য সভায় তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার অভিপ্রায়ে আপনাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে, আপনারা তাঁহাদের যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করুন।

এই কথা বলিবার পর, রাজা, প্রজা, জমিদার ও তালুকদারগণ একে একে ধর্ম্মরাজের সিংহাসনের সমীপে আসিয়া অভিবাদন করিয়া যথাযোগ্য উপঢৌকন প্রদান করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই সকল কার্য্য শেষ হইলে পর সভাভঙ্গ হইল। রাজা পাণ্ডবগণকে লইয়া বিশ্রাম জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এইরূপ সভার কার্য্য সপ্তাহকাল চলিল। নানাস্থান হইতে রাজা প্রজা আসিয়া নানাবিধ উপঢৌকন প্রদান করিয়া ধর্ম্মরাজের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ধন রত্নে, মণি কাঞ্চনে, রাজকোষ পূর্ণ হইল। অগণ্য হয়, হস্তি রথে অশ্বশালা ও শকটশালা পূর্ণ হইয়া গেল। চারিদিকে হুলুস্থুল ব্যাপার। এদিকে নগরে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ঘরে ঘরে নৃত্যগীত বাদ্য চলিতেছে। রাজবাটীতেও নৃত্য গীত বাদ্য চলিতেছে। আর একদিকে ভূরিভোজনের আয়োজন হইয়াছে। অবারিত দ্বার, যে আসিতেছে, ভোজনে তৃপ্তিলাভ করিতেছে। কেবল "দীয়তাং ভূজ্যতাং" শব্দ হইতেছে নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের গৃহেও ভোজন ও নৃত্য গীত বাদ্য চলিতেছে। চারিদিকেই আনন্দের লহরী ছুটিতেছে। বিরাট রাজ্য অদ্য আনন্দ রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ সপ্তাহ কাল আনন্দ চলিতে লাগিল।

সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইলে পর একদিন বিরাটরাজ ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! এখন আমাকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন। ধর্ম্মরাজ বলিলেন বিরাটরাজ! আমরা প্রতিজ্ঞা মত ত্রয়োদশ বৎসর উত্তীর্ণ করিয়াছি এক্ষণে আমরা পিতৃরাজ্য পুনঃ প্রাপ্তি চাই, এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া কুরুরাজ সভায় দূত প্রেরণ করুন। বিরাটরাজ আদেশমত পত্র লিখাইয়া হস্তিনাপুরে দূত প্রেরণ করিলেন।

এদিকে দুর্য্যোধন সৈন্যসামন্ত লইয়া রণস্থলে দিগম্বরবেশে পড়িয়া আছেন। প্রত্যাগমন করিবার উপায় নাই। এক্ষণে কেমন করিয়া প্রত্যাগমন করিবেন, সকলে মিলিয়া তাহার উপায় স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রণস্থল হইতে দুই চারিটা ছিন্ন ভিন্ন শোণিত রঞ্জিত পরিচ্ছদ সংগ্রহ করিয়া দুই চারি জন দূতকে সজ্জিত করাইয়া, রাজপুরীতে সম্বাদ পাঠাইয়া পরিচ্ছদ আনিত হইল। সেই সকল পরিচ্ছদে কোন প্রকারে সজ্জিত হইয়া সকলে মিলিত হইয়া, বাতাহত কাক পক্ষীর ন্যায় রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। পরাজয়ের সম্বাদ বাত্যাবিতাড়িত অগ্নির ন্যায় চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িয়াছে;

দুর্য্যোধন লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদন করিয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। সে দিন গাত্র বেদনা দূর করিতে ও বিশ্রামে অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন সভাস্থলে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন যে, বিরাটরাজ্যে এমন কে বীর আছে, যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের ন্যায় বীরকে একা রণে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। বিরাটরাজ্যের কথাতো সামান্য কথা, পৃথিবীর মধ্যেই বা এমন কে বীর আছে যে এই সকল মহারথীকে একা রণে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। সকলে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে এই বীর গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন ব্যতীত আর কেহ নহে। তখন প্রশ্ন হইল যে ত্রয়োদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে কিনা। পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া বলিলেন সেই দিন ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। অতএব সেই বীর যে মহাত্মা অর্জ্জুন, এখন আর সে বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহ রহিল না। দুর্য্যোধন চিন্তিত হইলেন। এইবার পাণ্ডবদিগকে তাঁহাদের রাজ্য প্রত্যার্পণ করিতে হইবে। এই বিষয় লইয়া মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। যাঁহার যেরূপ মত তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন। দুর্য্যোধন কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া সে দিবস সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

ইহারই কয়েক দিবস পরে বিরাট রাজের দূত আসিয়া সভাস্থলে পত্র প্রদান করিলেন। পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া সকলে চিন্তিত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। দুর্য্যোধন মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন, আপনি এই মর্ম্মে পত্র লিখুন যে বিনা যুদ্ধে সূচের অগ্রভাগেরও জমি তাঁহাদিগকে দেওয়া হইবে না, ইহাতে তাঁহাদের যাহা অভিরুচি হয় তাহা করিবেন। মন্ত্রী সেই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া দূতের হস্তে প্রদান করিলেন। দূত পত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দূত বিরাট রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া বিরাটরাজের হস্তে পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। রাজা পত্রের উত্তর পাঠ করিয়া ধর্ম্মরাজকে শুনাইলেন। কুরুরাজের অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যারপরনাই চিন্তিত হইলেন। বিনাযুদ্ধে তাঁহাকে রাজ্য প্রত্যার্পণ করা হইবে না। জ্ঞাতিদিগের সহিত, পরমাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। ইহা মহা সমস্যার ব্যাপার। ধর্ম্মরাজ অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে এই বিষম বিপদের সময় শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ লওয়া আবশ্যক বোধ করিয়া দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করা হইল। যথাসময়ে দূত সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। সকলে মিলিয়া পরামর্শ হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কুরুরাজকে পাণ্ডবদিগের পিতৃরাজ্য প্রত্যার্পণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণও সেই প্রকার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কুরুরাজের প্রতিজ্ঞা অচল, অটল। তিনি বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের রাজ্য প্রত্যার্পণ করিবেন না ইহা স্থির। কুরুরাজ যখন কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তখন অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাগমন করিয়া ধর্ম্মরাজকে এই সম্বাদ প্রদান করিলেন। নিয়তি পরিবর্ত্তন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। কুরুরাজের সুমতি হইবে কেমন করিয়া? ভগবৎবাণী পূর্ণ হওয়া চাই। কুরুবংশ ধ্বংস হওয়া বিধির বিধান, ইহা খণ্ডাইবার নহে, তাই দুর্য্যোধন দম্ভসহকারে বলিয়া পাঠাইলেন যে বিনাযুদ্ধে সূচাগ্র ভাগের জমিও পাণ্ডবদিগকে দিবেন না।

"অতি দর্পে হতা লঙ্কা
অতি মানে চ কৌরবাঃ
অতি দানে বলির্ব্বদ্ধঃ
সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্।"

বিনা যুদ্ধে যখন রাজ্য প্রত্যার্পণ করা হইবে না, তখন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল। পাণ্ডবেরা অগত্যা যুদ্ধের আয়োজন করিতে তৎপর হইলেন। অপর পক্ষেও যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইল। ঘোরতর আয়োজন, বিরাট আয়োজন। এরূপ আয়োজন পূর্ব্বে কেহ কখন দেখে নাই। কিছুদিন পরে উভয় পক্ষের আয়োজন শেষ হইল। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় কুরুরাজকে পাণ্ডবদিগের রাজ্য প্রত্যার্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কুরুরাজের সেই একই কথা। অগত্যা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঘোরতর যুদ্ধ! এমন যুদ্ধ পূর্ব্বে কেহ কখন দেখে নাই ও শুনে নাই। এইরূপ অষ্টাদশ দিন ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। এই অষ্টাদশ দিবস সৃষ্টিনাশকারী যুদ্ধে কুরুপক্ষীয় প্রায় সমস্ত বীর গণ ও হয়, হস্তি, রথ, ধ্বংস হইল, কেবল দুর্য্যোধন ও অল্প মাত্র সৈন্য অবশিষ্ট রহিল। যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে ভীম প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে অদ্য সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বে তিনি দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া যুদ্ধ শেষ করিবেন। অষ্টাদশ দিবসের প্রাতঃকাল হইতে ভীম ও দুর্য্যোধনে গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অতি ভীষণ গদাযুদ্ধ! সমস্ত দিন এইরূপ অতি ভীষণ গদা যুদ্ধ চলিল, কিন্তু কেহ

কাহাকেও পরাস্ত করিতে সক্ষম হইলেন না। ভীম গদাযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তথাপি দুর্যোধনকে কেন যে পরাস্ত করিতে পারিতেছেন না তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। ভীম জানিতেন না যে দুর্যোধনের মাতা ধর্ম্মশীলা গান্ধারী, পুত্রকে রণে অজেয় করিবার অভিপ্রায়ে বাল্যকালে দুর্যোধনের দেহ, কেবল কটিদেশ ব্যতীত, অপর সমস্ত অংশ যোগবলে শুভ দৃষ্টে পাষাণবৎ কঠিন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই গোপনীয় কথা কেবল শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই অবগত ছিলেন না। সুতরাং ভীমের গদাঘাতে কোনই ফল হইতেছে না। দুর্যোধন অক্ষত হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। এদিকে দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইবার সময় আগত প্রায়। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন ভীমের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হইবার উপক্রম হইয়াছে। তখন তিনি ভীমের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আপনার উরুদেশে চপেটাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, বাহবা ভীম! বাহবা ভীম! সাবাস! সাবাস! আর সঙ্গে সঙ্গে নয়নের ইঙ্গিতে দেখাইলেন যে উরুদেশে আঘাত কর। ভীম সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বজ্র মুষ্টিতে গদা ধারণ করিয়া দুর্যোধনের উরুদেশে ভীষণ আঘাত করিতে করিতে বলিলেন পাপিষ্ঠ! দুরাচার! কুরুকুল কলঙ্ক! তুমি পাণ্ডবদিগের পত্নীকে অঙ্কে বসাইতে অভিলাষ করিয়াছিলে? এই লও তাহার প্রতিফল! এই বলিয়া উপর্য্যুপরি গদাঘাত করিতে লাগিলেন, দুর্যোধনের উরুদেশ সেই আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ুও নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া নভঃ বায়ুর সহিত শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। পূর্ণ পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইল! প্রকৃতিরূপা নারী নির্য্যাতনের ফল ফলিল। ভগবৎবাণী পূর্ণ হইল! কুরুবংশ সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইল। ভারতে ধর্ম্মের জয় ঘোষিত হইল।

যুদ্ধের গোলযোগ শেষ হইলে এবং রাজ্যে শৃঙ্খলতা স্থাপন হইলে পর, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দ্রৌপদীকে লইয়া ভারত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এবং সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ নীতি অনুসারে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদিন পরে ভারতে শান্তি স্থাপন হইল। সঞ্জয় বলিয়াছেন—

যত্র যোগেশ্বর-কৃষ্ণো যত্র পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তত্র শ্রী র্বিজয়োভূর্তি ধ্রুবা নীতি র্মতির্ম্মম॥

গীতা ১৮ অঃ, ৭৮ শ্লোঃ।

অর্থাৎ যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেইখানে শ্রী, বিজয়, অচলা সম্পৎ এবং স্থিরা নীতি আছে, এই আমার ধারণা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারতে কুরুবংশ অতি প্রাচীন বংশ। ইহারই সমসময়ে ভারতের আর এক অংশে আর এক বংশের ধীরে ধীরে অভ্যুদয় হইতেছিল। সে বংশের নাম বৃষ্ণি বংশ। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র যখন কুরুবংশের রাজা ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন বৃষ্ণি-বংশের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণের সময় বৃষ্ণিবংশের শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য চরমসীমায় উঠিয়াছিল। কুরুবংশের কোন অংশে ন্যূন ছিল না। সুতরাং পতনেরও সময় ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হইতে-ছিল। কিন্তু বৃষ্ণিবংশকে ধ্বংস করিবার শক্তি তখন ভারতে আর কোন রাজারই ছিল না। পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত জ্ঞাতি ও বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রধান সহায় ছিলেন, পাণ্ডবেরাও তাঁহার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সহিত বিবাদের কোন কারণ ছিল না। শাস্ত্রে উক্ত আছে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। তিনি ধর্ম্মের সংস্থাপন,

পাপীর দমন এবং শিষ্টের পালন জন্য অবতাররূপে মর্ত্তে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

গীতা ৪ অঃ, ৭।৮ শঃ।

অর্থাৎ হে ভারত যখন যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুবৃত্তি সংরক্ষণের জন্য, দুষ্কর্ম্ম নাশের জন্য, এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ (প্রকাশিত) হই।

কোন বিষয়ের আধিক্য হইলেই তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। ইহাই প্রকৃতিক নিয়ম। বৃষ্ণিবংশের যেমন ধন, মান, ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অধর্ম্ম, দ্বেশ, হিংসা ও পাপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে পতনেরও কারণ সমুহ সৃষ্টি হইতে লাগিল। কুরুবংশের পতনের পর, বৃষ্ণিবংশে অধর্ম্ম ও পাপ অতি মাত্রায় বৃদ্ধি হইল। সুতরাং পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। পতনের কারণ সমুহ তো পূর্ব্ব হইতেই সৃষ্টি হইতেছিল, সেই সকল কারণের সূত্র লইয়া ক্রমে আত্মবিচ্ছেদ ও দলাদলি আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে প্রভাস তীর্থে লইয়া গিয়া কৌশলে যুদ্ধ বাধাইয়া আপনার বংশ আপনিই ধ্বংস করিলেন, অন্য কাহাকেই এ কার্য্য করিতে হইল না। তিনি দর্পহারী নারায়ণ, কাহারও দর্প রাখেন না, আপনার বংশেই বা তাহা কি জন্য রাখিবেন? সেইজন্য আপনার বংশকেও সমূলে ধ্বংস করিলেন। তিনি যে কার্য্যের জন্য জগতে আবির্ভাব হইয়াছিলেন, তাহা সমাধা করিয়া নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ধান হইলেন। দ্বাপর যুগেরও শেষ দশা আসিল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গৌরবরবিও অস্তমিত হইল।

ভারতের গৌরবরবি যে একদিনেই অস্তমিত হইল তাহা নহে, ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইল, এবং তাহা কি প্রকারে অস্তমিত হইল তাহা একবার বিশেষ করিয়া আমাদের জানা উচিত। কুরুবংশের পতনের পর শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা প্রায় বৃষ্ণিবংশেতেই ছিল।

যখন সে বংশেরও পতন হইল, তখন প্রায় সকলই নষ্ট হইল। অর্থাৎ এই দুই যুদ্ধে শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ প্রায় অধিকাংশই নিধন প্রাপ্ত হইলেন, আর যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা সকলেই অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিলেন। যে সকল মহাত্মার দ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়াছিল, তাঁহারাও নিধন প্রাপ্ত হইলেন। এখন জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবার লোক অভাব হইল, সুতরাং গ্রন্থ সকলের ব্যবহার অভাবে কীট দংশিত হইতে লাগিল এবং কালে সেই সকল অমূল্য গ্রন্থও নষ্ট হইয়া গেল। যাহার সহায়ে ভারত জ্ঞান বিজ্ঞানের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা সকলই নষ্ট হইয়া গেল। এই পতনের পর যে সকল লোক ভারতে জন্মগ্রহণ করিলেন তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থের অভাবে, এবং শিক্ষাদাতার অভাবে সেরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানবিদ্ হইতে পারিলেন না। এইরূপে ভারতবাসী ক্রমেই অবনতির দিকে আসিতে লাগিল। তৎপরে কলির আগমন হইল। এই যুগে শৌর্য্য, বীর্য্য ও মেধাবী মানুষের অভাবে স্বল্পায়ু ও ক্ষীণ বুদ্ধিবিশিষ্ট নরনারী উৎপন্ন হইতে লাগিল। ক্রমেই স্বল্প হইতে স্বল্পতর—ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর নরনারী উৎপন্ন হইতে লাগিল। যেমন উত্তম বৃক্ষের ফল উত্তমই হইয়া থাকে, এবং নিকৃষ্ট বৃক্ষের ফল নিকৃষ্টই হইয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ হইতে লাগিল। আবার কলির প্রভাব ও এই সকল নরনারীর উপর ক্রিয়া করাতে, তাহাদের আচার ভ্রষ্ট ও ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া তুলিল। একে তো মুনিঋষিকৃত গ্রন্থের অভাব, তাহার পর শিক্ষাদাতার অভাব, সুতরাং এই যুগের নরনারী আর সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের লোকের মত শৌর্য্য বীর্য্যশালী ও মেধাবী হইতে পারিলেন না। ক্রমেই তাঁহারা অধোগতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যে যোগবলে পূর্ব্ব তিন যুগের লোক এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সেই যোগ অভ্যাস একেবারে অবহেলা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যও পরিত্যাগ করিলেন, সুতরাং উন্নতি আর কেমন করিয়া হইবে? প্রকৃত শিক্ষার অভাবে তাঁহারা বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেন।

যে সকল গ্রন্থ ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, সেই সকল গ্রন্থ লইয়াই তাঁহারা বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক যোগ সাধনের অভাবে এবং গুরুর অভাবে সেই সকল গ্রন্থের গূঢ় অর্থবোধ করিতে না পারিয়া বিপরীত অর্থ করিয়া সকল কার্য্যই বিপরীত ভাবে করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাদের বংশধর, আমরাও অদ্যাবধি সেই ভাবে করিয়া আসিতেছি।

আমরা যখন তাঁহাদের সন্তানসন্ততি তখন আমরাও যে বিপরীত ভাবাপন্ন হইব ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? মুনিঋষিগণ সংযমী ছিলেন, তাঁহারা সকল সময়েই ব্রহ্মে যুক্ত হইয়া থাকিতেন, এবং সেই যুক্তাবস্থাতেই শাস্ত্রাদি রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই সকল শাস্ত্র অভ্রান্ত। তাঁহাদের যে সকল গুণ ছিল আমাদের তাহা নাই। আর আমরা যখন সংযমী ও যুক্তভাবাপন্ন নয়, তখন তাঁহাদের কৃত শাস্ত্রাদি বুঝিতে কেমন করিয়া সক্ষম হইব?

"গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণো।
বলীবলং বেত্তি ন বেত্তি নির্ব্বলঃ।
পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ।
করীচ সিংহস্য বলং ন মূষিকয়ঃ॥"

আমরা পুরাকালের সাধুদিগের ভাষা সকলই বিপরীত ভাবে বুঝিয়া, সকল কার্য্যই বিপরীত ভাবে করিতেছি, ফলও তাদৃশ হইতেছে। আমরা এখন ধর্ম্মকে অধর্ম্ম আর কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলিয়া থাকি। বস্তুতঃ ধর্ম্ম আর কর্ম্ম কি তাহা আমাদের একবারেই জানা নাই, কেবল মুখে ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া থাকি। যে কার্য্য দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ হইয়া ধর্ম্মরূপী নারায়ণকে জানিতে ও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই ধর্ম্ম আর তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম। ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু করা যায়, তাহাই অধর্ম্ম ও অকর্ম্ম। কিন্তু সেই কার্য্যটি যে কি তাহা আমরা জানি না, আর শিক্ষা দিবার লোকেরও অভাব, সুতরাং প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আমাদের শিক্ষা আসুরিক শিক্ষায় পরিণত হইয়াছে, এবং সেই ভাবেই আমরা সকল কার্য্য করিয়া যাইতেছি। আমাদের শিক্ষার মূলে যে দোষ আছে, তাহা আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিবারও শক্তি নাই। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি যে ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, তাহাও আমরা আমাদের বর্ত্তমান বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। যাহা কিছু করি, তাহাই উৎকৃষ্ট বোধে দৈত্যের হাসি হাসিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াই, আর আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। এই ক্ষীণ জ্ঞানে কার্য্য করিয়া আমরা ক্রমে আমাদের শিল্প বাণিজ্য ব্যবসা প্রভৃতি প্রায় সমস্তই এক প্রকার হারাইয়াছি।

সাধুদিগের কৃত কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া আপনাকে সাধু, ধার্ম্মিক

বা জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু এই কয়টী উপাধির মধ্যে কোনটীরও যে অধিকারী হইবার যোগ্য আমি নয়, তাহা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াও আমি শিক্ষা করিতে পারি নাই, তথাপি সাধু উপাধি লইয়া মার্জ্জিত (Refined) সাধুর বেশে, অর্থাৎ অধরোষ্ঠের কেশ মুণ্ডন করিয়া, চক্ষে স্বর্ণের চশমা লাগাইয়া, সাদা পাড় ধুতি ও লংক্লথের উত্তরীয় জড়াইয়া গম্ভীরভাবে ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া থাকি। আমার মতের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে, আমি তাহাকে ধর্ম্মদ্বেষী বা অধার্ম্মিক আখ্যা দান করিতে কুণ্ঠিত হই না। অধরোষ্ঠের কেশ স্পষ্ট উদ্গম হইবার পূর্ব্বেই আমি সেগুলি মুণ্ডন করিতে শিক্ষা করিয়াছি, তাহা না করিলে আমাকে প্রবীণ দেখায় না। আর উপস্থিত কালে দশম বর্ষের বালকও এই কার্য্য করিতে শিক্ষা করিয়াছে সুতরাং আমার সে কার্য্য না করা ভাল দেখায় না। জ্ঞানে প্রবীণ হই বা না হই, তাহাতে কিছু আসে যায় না, মুখের ভাবটী প্রবীণ দেখান চাইই। দ্বিতীয়তঃ এটী হাল ফ্যাসান, প্রত্যহ নবীন শ্মশ্রু মুণ্ডন না করিলে, আমার মতন সাধুর কাছে অসভ্য (Rustic) বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়, সুতরাং সেটা আমার করা চাইই। কিন্তু এইরূপ করাতে যে গণ্ডস্থলের চর্ম্ম মহিষের পৃষ্ঠের চর্ম্মের ন্যায় কঠিন, কর্কশ ও কুদৃশ্য হয়, আর গণ্ডস্থলের কেশগুলি অশ্ব পুচ্ছের ন্যায় কঠিন হয় তাহা আমি জানিয়াও জানিতে চাহি না। পিতা মাতা বা অন্য কোন গুরুজন এ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেও, তাহা যে করা অনুচিত, তাহা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াও আমার সে জ্ঞান হয় নাই, অথচ আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। আমি একটী কিম্ভুতকিমাকার জীব!

আমি কখন কখন, আর এক প্রকার সাধুর বেশ ধারণ করিয়া থাকি, অর্থাৎ গেরুয়া বসন, গেরুয়া উত্তরীয় ও গেরুয়া পাগ্‌ড়ীতে সজ্জিত হইয়া, কখন সকাছা, কখন বা অকাছা, কখন সশ্মশ্রু, কখন বা অশ্মশ্রু অবস্থায় চক্ষু যুগলে স্বর্ণের চসমা লাগাইয়া ধর্ম্মের বক্তৃতা করিয়া থাকি। আর বক্তৃতার অবসানে একখানি চাঁদার খাতা ঝুলি হইতে বাহির করিয়া, শ্রোতাদিগকে বলি সাধুদিগের সেবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ তাম্র বা রজত মুদ্রা দান করুন। আবার কখন কখন, ঝুলি হইতে একটী ক্ষুদ্র পেট কাটা কাষ্ঠের বাক্স বাহির করিয়া, কোন কথা না বলিয়া দর্শকবৃন্দের সম্মুখে ধারণ করি; আমার কোন কথা বলিবার আবশ্যক হয় না, কারণ বাক্সের গাত্রে লালরঙে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "শ্রদ্ধয়া দেয়ং।" আমি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া ধর্ম্ম

যে কি, আর কাহাকে বলে তাহা শিক্ষা করি আর নাই করি, এগুলি কিন্তু আমি বেশ শিক্ষা করিয়াছি। আমার ধর্ম্ম এই প্রকার। আমার কর্ম্মটী কি এইবার তাহা বলিব।

মোগল পাঠান এদেশে আসিবার পর কফি পান প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশের ধার্ম্মিক ও পণ্ডিতগণ কফি পান করা এদেশের উপযোগী নয় বিবেচনা করিয়া তাহা স্পর্শও করিতেন না। তাহার পর ইংরাজ এদেশে আসিয়া চা পান করা প্রচলিত করিলেন। আমি হাল ফ্যাসনের সাধু, অর্থাৎ নব্য সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু, আমি সেটী অনুকরণ করিতে শিখিলাম। পরের চালচলন অনুকরণ করিতে আমি বিশেষ দক্ষ। এমন দক্ষতা আমার আর কোন কর্ম্মেই নাই; কিন্তু আমার চালচলন, অন্য কোন জাতীয় লোক যে অনুকরণ করে না, তাহা দেখিয়াও আমার শিক্ষা হয় না, তথাপি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিয়া থাকি।

যাহা হউক আমি চা পান করা শিক্ষা করিয়াছি, তাই প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই আমার প্রথম কার্য্য চা পান করা। যথাসময়ে সেটী না পাইলে আমার জঠরানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। আমার চালাঘরের ভিতরে, হাঁড়িতে চাল নাই, উপরেও চাল নাই, কিন্তু চা পান করা চালটী আমি প্রাণ থাকিতে ছাড়িতে পারি না; তাই প্রাতে উঠিয়াই প্রথমে চা পান করিয়া থাকি। দ্বিতীয় কর্ম্মটী, চা পান করিয়া মুখ শুদ্ধির জন্য পান খাইয়া থাকি। আমি হাল ফ্যাসানের সাধু, আমার নিরামিষ পান ভাল লাগে না, তার সঙ্গে খানিকটা দোক্তা চাই, তাই দোক্তাসংযুক্ত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, আমার চেলাদিগের সঙ্গে ধর্ম্মের আলোচনা ও খোসগল্প করিয়া কতকটা সময়, অতিবাহিত করিয়া থাকি। দোক্তা ভোজন করা বর্ত্তমান কালে দশম বর্ষের বালক বালিকা হইতে, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেই অভ্যাস করিতে শিক্ষা করিয়াছে। সুতরাং দোক্তাভোজন করা আমার পক্ষে অন্যায় হয় না। নবীন শ্মশ্রু মুণ্ডন না করিলে পাছে কেহ অসভ্য বলে, এই আশঙ্কায় আমি প্রত্যহ তাহা করিয়া থাকি, আর পান দোক্তা ভোজন করিতে করিতে যে প্রতি মুহূর্ত্তে রঞ্জিত পানের পিক মুখ হইতে নিক্ষেপ করিয়া, ঘর বাড়ী নষ্ট করি, ইহা আমার জ্ঞানে অসভ্যতা বলিয়া মনে হয় না। দোক্তা যে কাঁচা বিষ, আর এই ভাবে খাওয়া যে মহা অনিষ্টকর, তাহা বালক বালিকাদেরও জ্ঞান নাই, আর আমি পুস্তক সকল পাঠ করিয়াও সে জ্ঞান লাভ করিতে

পারি নাই। ধর্ম্ম জিনিষটা অতি সহজ বোধে আমি অতি সত্বরই শিক্ষা করিয়া ফেলিয়াছি। কাঁচা লোঙ্কা ভক্ষণ করিলে ক্ষুধামান্দ্য, কণ্ঠের স্বর বিকৃত, মস্তিষ্ক বিকৃত, দেহ বর্দ্ধিত হইবার প্রত্যবায়, এবং আরও যে কত অনিষ্টকর, তাহা আমার জানা নাই, অথবা জানিয়াই করিয়া থাকি, না করিলে শরীরটা ঠিক ধাতে আইসে না। তৎপরে আমার তৃতীয় কর্ম্ম ক্ষৌরকর্ম্ম। মুখে খানিকটা চুণ মাখাইয়া, না, না, সাবান মাখাইয়া; চুণ বলিলেও ভুল হয় না, কারণ চুণ ব্যতীত সাবান প্রস্তুত হয় না। যাহা হউক চুণ না বলিয়া সাবান বলাই আমার উচিত, কারণ সাবান না বলিলে আমার হাল ফ্যাসানের সাধু নামে কলঙ্ক হইবে। মুখে সাবান মাখাইয়া গণ্ডস্থলের কেশ উদ্গম হইয়া থাকুক বা নাই হউক, তথাপি আমি মুণ্ডন কার্য্যে নিজেই প্রবৃত্ত হই। ইংরাজ বাহাদুরদিগকে ধন্যবাদ, তাঁহাদের কৃপায় আমাকে প্রামাণিক অনুসন্ধান করিবার জন্য ছুটাছুটী করিতে হয় না। তাঁহারা সে কষ্ট অনেক দিন পূর্ব্বে নিবারণ করিয়াছেন। তাঁহারা নখ কাটা, চুল কাটা ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিবার কল সকলই আনিয়া যোগাইতেছেন। তাহারই সহায়ে ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা করি। তৎপরেই স্নান করিয়া কোটাচটা কাটিয়া পূজায় বসি। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে কাহার পূজা কর, তাহা হইলে বলি ভগবানের পূজা করি। এইখানে আমার একটু গণ্ডগোল হয়, অর্থাৎ যাঁহার আকৃতি কখন দেখি নাই, তাঁহার পূজা যে কেমন করিয়া হয় তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু সে কথা পসার নষ্টের ভয়ে আমি কাহাকেও বলি না। আমার বিশেষ গোলমাল বাধে যখন আমি ভগবানের উদ্দেশে ফুল তুলসী অর্পণ করি। কারণ যাঁহার উদ্দেশে ফুল তুলসী অর্পণ করি, তিনি যে আমার প্রদত্ত দ্রব্যাদি কিরূপে প্রাপ্ত হন তাহা বুঝিতে পারি না। বুঝিতে পারি না তাহার কারণ এই যে, যদি কেহ আমার উদ্দেশে অন্নজল প্রদান করে, কই তাহাতে তো আমার পেট ভরে না? তবে ভগবানের উদ্দেশে কোন দ্রব্য প্রদত্ত হইলে তিনি যে কেমন করিয়া পাইবেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমি না বুঝিলেও তাহা লোকের কাছে প্রকাশ করি না। বাহ্যিক ভক্তি আমি যথেষ্ট পরিমাণে দেখাইয়া লোকের নিকট, অবশ্য আমার মতন লোকের নিকট, ধার্ম্মিক ও ভক্ত উপাধি লাভ করিয়া থাকি। বিনা আয়াসে ও বিনা ব্যয়ে এইরূপ উপাধি লাভ করা কিছু মন্দ নয়। প্রকৃত ভক্তি করা হইল কি না, তাহা আমার জানিবার কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ আমার যাহা আবশ্যক

তাহা আমি বিনা আয়াসেই পাইয়া থাকি। আমার ধর্ম, কর্ম ও ভক্তি এইরূপ।

প্রকৃত ভক্তি যে সাধনার ধন তাহা আমার জানা নাই। বিনা সাধনে যে ভক্তি হয় না, হইতে পারে না, তাহাও আমার জানা নাই। শ্রীভগবান গীতায় ১২ অঃ ভক্তির যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিনা সাধনে হইবার নয়। জ্ঞান ও ভক্তিতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বিনা জ্ঞানে ভক্তি আসিতে পারে না। আর সেই জ্ঞান যে কি, তাহা ভগবান গীতায় ৭ম অঃ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ভগবান গীতায় তৃতীয় অঃ যে কর্মযোগের বর্ণনা করিয়াছেন; তাহার সাধনা করিতে হয়, নচেৎ প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। সুতরাং ভগবানের প্রতি ভক্তি দেখাইতে হইলে প্রথমতঃ গীতোক্ত কর্মযোগের সাধনা করিতে হয়, পরে জ্ঞানযোগের সাধনা করিয়া, ভক্তিযোগের অভ্যাস করিয়া ভক্তি কাহাকে বলে, আর ভক্তি কিরূপে দেখাইতে হয়, সেই সকল জ্ঞাত হইয়া তৎপরে ভগবানে ভক্তি দেখাইতে হয়, নচেৎ লৌকিক বা মৌখিক ভক্তি, ভক্তিই নয়। এই সকল বিষয় আমার জানিবার আবশ্যক হয় না, আর তাহা জানাও সহজ ব্যাপার নয় বলিয়া কোন প্রকারে গোলে হরিবোল দিয়া পূজার কার্য্য শেষ করিয়া, লোকের কাছে ধার্ম্মিক, ভক্ত ও জ্ঞানী উপাধি লাভ করিয়া, আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকি। যে ঢুলির ঢোল ভাঙ্গা, সে সেই ভাঙ্গা ঢোল লইয়া দুই হাত, দুই পা তুলিয়া নাচিতে নাচিতে বাজাইয়া দর্শকবৃন্দের বাহবা লইয়া থাকে, আমার ধর্ম কর্ম ও উপাধি লাভ সেই প্রকার। ধর্ম কি এবং কাহাকে বলে সে সকল আমার কিছুই জানা নাই, কেবল সাধুর বেশ ধারণ করিয়া ঠাকুর দেবতায় বাহ্যিক ভক্তি দেখাইয়া ভক্ত, সাধু, প্রভৃতি উচ্চদরের উপাধি লাভ করিয়া থাকি। কেবল তাহাই নয়, এইরূপ ভণ্ডামীতে কিছু প্রাপ্তিও আছে, এই দুর্দ্দিনে এতগুলি প্রাপ্তি মন্দই বা কি?

বস্তুতঃ ধর্ম যে কি বস্তু তাহা জানিতে হইলে কোটাচটা কাটিয়া ফুল তুলসী দিয়া পূজা করিবার কিছুই প্রয়োজন হয় না, সে সকলই লৌকিক ও বাহ্যিক, তাহাতে কোন ফল হয় না, তবে সাধারণ লোকের নিকট ধার্ম্মিক ও ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য ঐ সকল উপকরণ ও উপায় মন্দ নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সাধনাবিহীন লোকের কাছে এই সকল কথা বলিলে আর নিস্তার নাই, অযথা তর্ক ও চিৎকার করিয়া গগণমণ্ডল বিদীর্ণ

করিয়া থাকে। তর্ককদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম কি তাহা জানা থাক্ আর নাই থাক্, কণ্ঠের জোর প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাহার সহায়ে, এবং হাত পা নাড়িয়া যথা বা অযথা ভাবে তাহারা স্বমত সিদ্ধান্ত করিতে বিশেষ পারদর্শী। সত্য কথা শুনিবারও লোক পাওয়া যায় না, বলিবারও লোক পাওয়া যায় না। যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী, এবং প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারা অযথা তর্কের আশঙ্কায় কোন কথা না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া সকলই শ্রবণ করেন ও মনে মনে হাসিয়া থাকেন। তাই পরম সাধু তুলসী দাস অতি দুঃখে বলিয়াছেন :—

সাচ্চা কহে তো মারে লাট্টা, ঝুটা জগৎ ভুলাই।
গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকাই ॥
চোর্‌কো ছোড়ে সাধ্‌কো বাঁধে, পথিক্‌কো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা, দুখ লাগে আর হাঁসি ॥

দোঁহা ১৪৯।

প্রকৃত কথা এই, ধর্ম্ম এক বই দুই নয়। আমরা ভেদ জ্ঞানে ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন দেখিয়া থাকি, অর্থাৎ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ইত্যাদি। সেই জন্য আমাদের দেশে ভ্রম বশতঃ চিরকালই ধর্ম্ম বিভ্রাট বর্ত্তমান আছে।

শাস্ত্রে উক্ত আছে যথা,—

অভেদো ভাসতে নিত্যং বস্তু ভেদো ন ভাসতে।
দ্বিধা ত্রিধাদি ভেদোহয়ং ভ্রমত্বে পর্য্যবস্যতি ॥

শিবসংহিতা জ্ঞানকাণ্ড ৪৮।

অর্থাৎ অখণ্ড বিশুদ্ধ জ্ঞানে অভেদ ভাবই ভাসমান হয়; বস্তুভেদে ভাসমান হয় না, খণ্ড জ্ঞানে দ্বিধা ত্রিধা প্রভৃতি যে দ্রব্যভেদ লক্ষিত হইতেছে, তাহা ভ্রমত্বে পর্য্যবসিত হয়।

পুস্তক পাঠ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা জানা যায় না, সুতরাং প্রকৃত ধার্ম্মিকও হওয়া যায় না। পুস্তকের ভাষা পাঠ করিয়া তাহার সারাংশ গ্রহণ করিতে না পারিয়া, সাররূপ আশ্রয় বিহীন হইয়া ধর্ম্মরূপ মহাসমুদ্রে কেবল ভাসিয়া বেড়াইতে হয়। ধর্ম্মরূপী নারায়ণ বেদে নাই, বাইবেলে নাই, পুরাণে নাই, কোরাণে নাই, মক্কায় নাই, মেদিনায় নাই, অথচ তিনি সর্ব্বত্র সমানভাবে বিরাজ করিতেছেন। তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, চর্ম্মচক্ষের অগোচর, আর

আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের সহায়ে তাঁহাকে উপলব্ধি করা অসম্ভব। তিনি জ্ঞান গম্য ও জ্ঞান লভ্য, অন্য কিছুতেই তাঁহার দর্শন বা তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না। সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে গীতোক্ত কর্ম্মযোগের সাধনা করিতে হয়, এবং কর্ম্মযোগের সাধনা দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার সহায়ে তাঁহাকে জানিতে ও দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ম্মযোগ হইতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকেই সাংখ্য কহে। এই সাংখ্য হইতে সাংখ্য যোগ। সাংখ্যযোগ ও রাজযোগ এ দুইটী একই জিনিস। রাজ শব্দে দীপ্তি অথবা প্রকাশ। অর্থাৎ যাহা দ্বারা পরমাত্মার প্রকাশ হয়, তাহাই রাজযোগ। রাজযোগ কর্ম্মযোগের স্তরের অবস্থা। সুতরাং সেই কর্ম্মযোগের সাধনাই প্রকৃত কর্ম্ম, আর সেই কর্ম্ম করাই প্রকৃত ধর্ম্ম, ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু করা যায় তাহা তদ্‌বিপরীত। কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মন্যাস দুইই ফলপ্রদ, তন্মধ্যে কর্ম্মযোগ জ্ঞান লাভের উৎকৃষ্টতর পথ। কর্ম্মযোগ সদ্‌গুরু বক্ত্র গম্য।

কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, সুতরাং কর্ম্মই ব্রহ্ম। কর্ম্মযোগের সাধনা দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান ও ব্রহ্ম লাভ হয়। তিনিই ধর্ম্মরূপী নারায়ণ। তাঁহাকে যিনি তত্ত্বতঃ জানেন তিনিই ধার্ম্মিক ও সাধু, তদ্‌ব্যতীত আর সব অসাধু ও বক ধার্ম্মিক। সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে সন্তরণশীল মীনের দর্শন পাইলেই, যেমন সুচতুর মীনঘাতী সবেগে সলিলে পড়িয়া চঞ্চু দ্বারা মীনকে ধরিয়া উদরস্থ করিয়া ফেলে, উপস্থিত কালের ধার্ম্মিক ও সাধু সকল সেই প্রকার। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥

গীতা ৩য় অঃ ১৫ শঃ।

অর্থাৎ কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে জাত, অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সদাযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

দেবর্ষি নারদ ভগবানকে বলিয়াছিলেন যে প্রভু আপনি কোথায় থাকেন, আমি তাহা স্থির করিতে পারি না, আপনার থাকিবার স্থান কোথায় তাহা আমাকে বলুন, তাই ভগবান বলিয়াছিলেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

অর্থাৎ হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদিগের হৃদয়েও থাকি না, আমার ভক্তেরা যেখানে আমার নাম গান করেন আমি সেই খানে থাকি।

ভগবানের এই উক্তিতে বুঝিতে পারা যায়, যে ভক্ত তাঁহার অতিশয় প্রিয়, সুতরাং ভগবানের ভক্ত হইতে হইলে যোগ পথ অবলম্বন করিতে হয়, যোগ পথ অবলম্বন ব্যতীত ভগবানের ভক্ত হওয়া যায় না। সেই যোগ পথ অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমে গীতোক্ত কর্ম্মযোগের অভ্যাস করিতে হয়, পরে জ্ঞানযোগ, তৎপরে ভক্তিযোগের অভ্যাস করিয়া ভগবানের ভক্ত হইতে হয়। এবং ভক্ত হইলেই ভগবানের প্রিয় হওয়া যায়। কিন্তু এত কাণ্ড করিয়া ভগবানের ভক্ত ও প্রিয় হওয়া সকলকার সাধ্যায়ত্ত নয় বলিয়া ভগবান আর একটী সহজ উপায় গীতায় বলিয়া দিয়াছেন তাহা করিলেই ভগবানের ভক্ত ও প্রিয় হওয়া যায় তাহা এই—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনো বুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

গীতা ১২শ অঃ ১৩, ১৪ শ্লঃ।

অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দ্বেশ শূন্য, মৈত্র ও কৃপালু, মমত্বহীন, নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখে সমভাব, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতচিত্ত, মদ্বিষয়ে স্থির লক্ষ ও আমাতে মনোবুদ্ধি সমর্পণকারী (এরূপ) যে আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয়। ভগবান উপরে যে সকল কার্য্যের কথা বলিয়াছেন সেগুলির মধ্যে ২টী ব্যতীত সকলই সাধ্যায়ত্ত। সে দুইটী এই যে তিনি অবাঙ্মনসগোচর অর্থাৎ তিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহার প্রতি স্থির লক্ষ ও তাঁহাতে মনোবুদ্ধি সমর্পণ কেমন করিয়া যে করা যায়, তাহা সাধনা বিহীন মানবের পক্ষে বুঝিতে পারা অসম্ভব। কিন্তু ইহা যে করা যায় না তাহা নহে। ইহা করিতে হইলে সদ্‌গুরুর সহায় আবশ্যক, তিনি যে পথ বা উপায় দেখাইয়া দেন সেই পথ অবলম্বন করিলেই তাহা সহজ সাধ্য হয়। সদ্‌গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দিয়া অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া শিষ্যের দেহতেই পরমাত্মার রূপ দেখাইয়া দেন, যৌগিক কৌশল দ্বারা তাহাতেই সর্ব্বদা স্থির লক্ষ রাখিতে এবং মনোবুদ্ধি

সমর্পণ করিতে হয়। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই ক্রমে ক্রমে ভগবানের প্রকৃত ভক্ত ও প্রিয় হওয়া যায়। এই জন্য ভগবান অর্জ্জুনকে যোগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। আর যোগী যে সকল মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাও তিনি বলিয়াছেন যথা :—

তপস্বি ভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥

গীতা ৬ষ্ঠ অঃ ৪৬ শঃ।

অর্থাৎ যোগী তপস্বীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।

শ্রীভগবান উপরোক্ত শ্লোকে তিনটী কথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী, এই তিনটী কথার প্রকৃত অর্থ বোধ না করিতে পারিলে এই শ্লোকটি পাঠে কোনই ফল হইবে না। গীতার প্রত্যেক কথার গূঢ় অর্থ আছে তাহার একটী কথার ব্যাখ্যা করিতে হইলে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক হয়। আমাদের সেরূপ ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং আমরা সংক্ষেপেই ঐ তিনটী কথার গূঢ় অর্থ কি তাহা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

প্রথমতঃ তপস্বী, অর্থাৎ যিনি তপস্যা করেন অথবা তপলোকে থাকেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন ভগবানকে ডাকিতে হইলে, মনে, বনে আর কোনে। সুতরাং ভগবানের সাধনা করিতে হইলে সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে যাইতে হয় না। মন, বন ও কোন আমাদের এই দেহতেই আছে। সেই কোনই তপলোক, তাহাই ধ্রুবলোক, তাহাই সত্যলোক এবং তাহাই বৈকুণ্ঠ। সেই স্থানে মনকে স্থায়ী করিতে পারিলেই, প্রকৃত তপস্যা করা হয়, আর সেই অবস্থাকেই তপলোকে বাস করা বলে। সদ্‌গুরুই তাহার উপায় দেখাইয়া দেন।

দ্বিতীয় জ্ঞানী, ভগবান গীতার ৪র্থ অঃ যে জ্ঞানের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সাধনা দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়,সেই জ্ঞানে যিনি জ্ঞানী, এস্থলে অন্য কোন জ্ঞানীর কথা তিনি বলেন নাই। তৎপরে কর্ম্ম, ভগবান গীতার ৩য় অঃ যে কর্ম্মযোগের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই কর্ম্মের কর্ম্মী। যাগ, যজ্ঞ, পূজা প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম সে সকল কর্ম্মের কথা তিনি বলেন নাই। সে সকল কর্ম্মে জীবের বদ্ধাবস্থা কোন কালেই শেষ হয় না।

যে কর্ম করিলে মনুষ্য যুক্ত অবস্থা লাভ করে, সেই কর্মের কর্মীর কথাই তিনি বলিয়াছেন।

উক্ত শ্লোকে আমাদের আর একটী বিষয় বিশেষ করিয়া জানিবার আছে, তাহা পরে বলা হইতেছে।

শ্রীভগবান উপরোক্ত শ্লোকে অর্জ্জুনকে যোগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। অর্জ্জুন সাজসজ্জা করিয়া কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, তিনি জীবিত থাকিবেন কি গতায়ু হইবেন তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই, অথচ ভগবান তাঁহাকে যোগী হইতে উপদেশ দিতেছেন। অপর কেহ এইরূপ বলিলে তাহাকে পাগল ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইত না, কিন্তু ভগবান যখন এই কথা বলিয়াছেন তখন অবশ্য ইহার কোন গূঢ় অর্থ আছে. তাহা না বুঝিতে পারিলে গীতা পাঠ বৃথা। তাহার গূঢ় অর্থ এই, কুরুক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হইয়াছিল সে যুদ্ধের বিষয় ভগবান গীতায় উল্লেখ করেন নাই। গীতায় যে যুদ্ধের কথা আছে তাহা দেহরূপ কুরুক্ষেত্রে দেবাসুরের যুদ্ধের বিষয়, যাহা নিত্যই এই দেহে হইতেছে। পুরাণে উক্ত আছে যে এই দেবাসুরের যুদ্ধ শত বৎসর ব্যাপিয়া চলিয়াছিল ; তাহার অর্থ, মনুষ্যের আয়ু শত বৎসর কাল, এই শত বৎসর কাল মনুষ্য দেহে এই দেবাসুরের যুদ্ধ হয়। যদিও খনা বলিয়াছেন—

> নরা গজা বিশে শয়।
> তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়॥

অর্থাৎ নর আর গজের আয়ু এক শত বিশ বৎসর, আর তার অর্দ্ধেক আয়ু অশ্বের, কিন্তু সাধারণতঃ মনুষ্য এক শত বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না, যদিও দুই একজন শত বৎসরেরও অধিক জীবিত থাকে, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম বলিয়া গণ্য করা যায় না। সেই জন্য পৌরাণিকগণ মনুষ্যের আয়ু শত বৎসরই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই দেহ মধ্যে এই দেবাসুরের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, অর্থাৎ একবার দেবভাবকে পরাজিত করিয়া আসুরভাবের উদয় হয়,আবার আসুরভাবকে পরাজিত করিয়া দেবভাবের উদয় হয়। আর মনুষ্য যতদিন জীবিত থাকে, অর্থাৎ যদি খুব বেশীদিন জীবিত থাকে, তবে শত বৎসর পর্য্যন্ত ; এই শত বর্ষ কাল মনুষ্য দেহরূপ কুরুক্ষেত্রে দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতে থাকে। ইহাই শত বৎসর ব্যাপী দেহরূপ কুরুক্ষেত্রে দেবাসুরের যুদ্ধ, এবং এই যুদ্ধের বিষয়ই ভগবান গীতায় বর্ণনা করিয়াছেন।

সাধনা বিহীন লোক অন্যরূপ বুঝিয়া থাকেন। এখন দেবাসুরের যুদ্ধ যে কি, তাহাই আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। মনুষ্য দেহে সত্ব, রজ ও তমগুণের প্রাধান্য অনুসারে একবার দেবভাবের উদয় হয়, আর একবার আসুরিক ভাবের উদয় হয়—সত্বগুণের উদয়ে দেবভাব, আর রজস্তমোগুণের উদয়ে রিপুর প্রাধান্য বশতঃ আসুরিক ভাব হইয়া থাকে। দেবভাবের উদয়ে প্রবৃত্তিগুলি সৎ হয় এই জন্য সেই সময়ের কার্য্যসমূহও সৎ হইয়া থাকে, আর আসুরিক ভাবের উদয়ে প্রবৃত্তি গুলি আসুরিক ভাবাপন্ন হওয়ায় সেই সময় সকল কার্য্যই অসুরের ন্যায়, অর্থাৎ নীচভাবাপন্ন হয়। দেবভাবাপন্ন বৃত্তিগুলি আত্মভাব, আর আসুরিক বৃত্তিগুলি ইন্দ্রিয়ের ভাব, এই দুই ভাবের উদয় অনুদয়ের নামই দেবাসুরের যুদ্ধ। মন ইন্দ্রিয়গণের রাজা, তাঁহার রাজত্ব ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া। কিন্তু তাঁহার সদ্ সদ্ বিচার করিবার শক্তি নাই, তিনি বুদ্ধির সহায়ে সদ্ সদ্ বিচার করিয়া থাকেন। এই জন্য মনকে অন্ধ বলা যায়। ভগবান অর্জ্জুনকে যোগী হইতে বলিবার অর্থ এই,যে তুমি যোগবলে বলীয়ান হইয়া মনকে জয় করিয়া মনরাজ্য ধ্বংস কর, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি ধ্বংস করিয়া আত্মরাজ্য স্থাপন কর, অর্থাৎ আত্মভাবাপন্ন হও। মহাভারতে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিষয় উল্লেখ আছে, তাহাতে মনকে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর দশ ইন্দ্রিয়ও তাহাদের দশ দশ প্রবৃত্তি, মোট এক শত, ইহাদেরই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ মন জয় করা অতি কঠিন কার্য্য, এমন কঠিন কার্য্য জগতে আর কিছুই নাই। মনকে জয় করিতে পারিলেই জীব শিবে পরিণত হয়, ইহাই আত্মভাব। তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

রাজা করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণ জই।
আপ্না মন্‌কো বশ করে যো, সবকো সেরা ওই॥

দোঁহা ১৯।

গীতা দুই অর্থে লেখা, যিনি যে ভাবে বুঝিবেন তিনি সেই ভাবে তাহার ফললাভ করিবেন। সমগ্র গীতার তাৎপর্য্য এই যে, গীতায় যে সকল যোগের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ইত্যাদি, তাহার সাধনা দ্বারা, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি (কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি) জয় করিয়া চিত্ত স্থির হইলে, সেই স্থিরচিত্তে ভগবানে তন্ময় হইলেই ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে।

অন্য কিছুতেই ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে না। আর সকল কথার সার কথা ভগবান্ পুনরায় গীতার ১৮শ অঃ ৬৫ ও ৬৬ শ্লোকে বলিয়া গীতা সমাপ্ত করিয়াছেন। সেই মত কার্য্য করিতে হইলে সিদ্ধাবস্থাপন্ন যোগীর নিকট উপদেশ লইয়া সাধনা করিতে হয় নচেৎ সাধনা বৃথা হয়।

যাহা হউক ধর্ম্মসম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা না করিয়া আমাদের অবনতির পর, অন্য অন্য দেশের লোক কি উপায়ে উন্নতি করিল, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

আমাদের যে সময় হইতে পতনের সূত্রপাত হইল, প্রায় সেই সময় হইতেই ইয়োরোপবাসীরা জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া জগতের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। এখন তাঁহারা জ্ঞানবিজ্ঞানের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। যে ভারতবাসী জ্ঞানবিজ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ এক সময় জগতের লোককে বিতরণ করিয়াছিল, এখন তাঁহাদের ইয়োরোপবাসীরা বলেন অসভ্য! আমরা বিজ্ঞানের বিষয় কিছুই জানিতাম না। এরোপ্লেন কি বস্তু তাহা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আমাদের এরোপ্লেন ছিল না সত্য। কিন্তু আমাদের পুষ্প রথ ছিল, দেবর্ষি নারদের ঢেঁকী কল ছিল, যাহাতে আরোহণ করিয়া তিনি স্বর্গে গমনাগমন করিতেন। আমাদের কামান বন্দুক ছিল না, তাহাও সত্য, কিন্তু আমাদের অন্যপ্রকার আগ্নেয়অস্ত্র ছিল। আমাদের বিষাক্ত বাষ্প প্রস্তুত করিবার শক্তি ছিল না, সত্য, কিন্তু আমাদের সংমোহন বাণ নির্ম্মাণ করিবার শক্তি ছিল। আমাদের অর্ণবপোত ছিল না, সুতরাং আমরা সমুদ্রে যাতায়াত করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমাদের দেশে শ্রীমন্ত সদাগর, ধনপতি সদাগর, অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া বাণিজ্য উপলক্ষে সমুদ্রে যাতায়াত করিতেন। আমাদের এখনও যে সকল গ্রন্থ আছে তাহাতে বিজ্ঞানের কার্য্য কৌশলের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা এতই হীন অবস্থাপন্ন হইয়াছি যে আমাদের পুষ্পরথের বিষয় পাঠ করিয়া আমরা ইহা অসম্ভব বলিয়া অগ্রাহ্য করিতাম, কিন্তু যখন জার্ম্মাণ জাতি এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া জগতে প্রকাশ করিল, তখন আমাদের পুষ্পরথের কথা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যাহা হউক এ বিষয় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যদি কেহ স্থিরচিত্তে এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের এ সকলই ছিল।

আমাদের এই সকল ছিল, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের মনে

স্বতই উদয় হইতে পারে যে, তবে এ সকল কোথায় গেল, এবং জার্ম্মাণ জাতিই বা কেমন করিয়া এই সকল আশ্চর্য্য বিষয় জগতে প্রকাশ করিল। অবশ্য সে বিষয় আমাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর সম্ভব সে বিষয় একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। আমরা দেখিতে পাই যে জার্ম্মাণ জাতির নিজেদের ভাষা আছে, অর্থাৎ তাঁহাদের মাতৃভাষা। ইহা ব্যতীত সেখানে সংস্কৃত ভাষারও যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়া থাকে, এবং তাঁহারা সংস্কৃত ভাষাতেও বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছেন, এবং এখনও সেখানে সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট চর্চ্চা চলিতেছে। এক্ষণে আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে তাঁহারা কেমন করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিলেন, এবং কি উপায়ে এই ভাষা শিক্ষা করিলেন। অবশ্য জগতে কিছুই অসম্ভব নাই। আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থ সকল কি প্রকারে নষ্ট হইল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে জার্ম্মাণ জাতি সংস্কৃত গ্রন্থ সকল কেমন করিয়া সংগ্রহ করিল এবং কেমন করিয়া সেই ভাষা শিক্ষা করিল তাহার উত্তরে আমরা এই বলি, জগতে যখন কিছুই অসম্ভব নয়, তখন ইহাও অসম্ভব নয়, যে ভারতের সেই দুই ধ্বংসকরী যুদ্ধের সময় কিম্বা তাহার পরে কতকগুলি মহাত্মা প্রাণভয়ে অথবা তাড়নার ভয়ে, কিম্বা অন্য কোন কারণে কতকগুলি মূল্যবান জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্কৃত গ্রন্থ লইয়া অন্য দেশে পলায়ন করিয়াছিলেন, পরে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে জার্ম্মাণিতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইখানে যাইয়া জার্ম্মাণ জাতিকে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারাও সেই সকল গ্রন্থে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় সৃষ্টি করিবার কৌশল আছে জানিতে পারিয়া অদম্য উৎসাহের সহিত সেই সকল কৌশল শিক্ষা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলেন। অথবা ইহাও অসম্ভব নয় যে ভারতের সেই দুই যুদ্ধে যে অলৌকিক বিজ্ঞানের কার্য্য সমূহ প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহার বিষয় জানিতে পারিয়া কতকগুলি জার্ম্মাণ জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি ভারতে আসিয়া কোন মহাত্মার কাছে এই সকল শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে এই সকল শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়া বিজ্ঞানের গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তথায় যাইয়া স্বদেশবাসীদিগকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ স্বরূপ একজন জার্ম্মাণ ডাক্তার যোগের অদ্ভুত মাহাত্ম্য বিষয় জানিতে পারিয়া অতি অল্প দিন হইল, ভারতে যোগশিক্ষা

করিতে আসিয়াছিলেন। সে বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। আবার ইহাও আমরা দেখিয়াছি যে গত জার্ম্মাণ যুদ্ধে যে সকল আশ্চর্য্য বিজ্ঞানের কার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা ইতিপূর্ব্বে ইয়োরোপের অন্য কোন জাতিই দেখাইতে পারে নাই। জার্ম্মাণ জাতির এই সকল কার্য্য দেখিয়া ইয়োরোপের অন্য অন্য জাতিও এখন সেই সকল শিক্ষা করিয়া বিজ্ঞানের কার্য্য সমূহ দেখাইতেছেন। সেই ভারত মহাসমরে যে সকল অপূর্ব্ব বিজ্ঞানের কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা ইয়োরোপের কোন কোন জাতি জানিতে পারিয়া সেই সকল কোন প্রকারে শিক্ষা করিয়া আপন আপন দেশে প্রচলিত করিয়াছিল। ইহা কিছুই অসম্ভব নয়।

জগতে ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা নাই এবং ছিল না, কেবল ইদানীং জার্ম্মাণিতেই এই ভাষার চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক জ্ঞানী লোক বলেন যে ভারতবাসীর সহায়েই জার্ম্মাণ জাতি সংস্কৃত ভাষা এবং বিজ্ঞানের কৌশল সকল শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা বিজ্ঞানের সহায়ে অনেক পার্থিব উন্নতি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই করিতে পারেন নাই, ইহারই বা কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে হইলে যোগ শিক্ষা করিতে হয়, তাহা ব্যতীত কিছুতেই আধ্যাত্মিক উন্নতি করা যায় না। কিন্তু যোগ গুরুমুখী বিদ্যা; গ্রন্থ পাঠ করিয়া যোগশিক্ষা করা বিড়ম্বনা মাত্র। অবশ্য জার্ম্মাণ জাতি যোগের গ্রন্থ সকলও পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু যোগ শিক্ষা করিতে পারেন নাই। যোগের গূঢ় রহস্য সকল পুস্তকে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে, কিন্তু এরূপ কৌশলে লেখা আছে যে গ্রন্থ পাঠ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় নাই। যিনি তাহা করিতে যাইবেন তিনি সম্পূর্ণরূপে নৈরাশ হইবেন, অধিকন্তু উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণনাশ হইবে। সদ্‌গুরু ব্যতীত ইহা শিক্ষা করিবার উপায় নাই। গুরু শিষ্যের সম্মুখে বসিয়া স্বয়ং যোগের কৌশল সকল করিয়া দেখাইয়া শিষ্যকে শিক্ষা দেন। একদিন করিয়া দেখাইলেই যে শিষ্য শিখিয়া লইবে তাহাও নয়। প্রতি পদে পদে গুরুর সহায় আবশ্যক, তবে শিষ্য শিক্ষা করিতে পারে, নচেৎ নয়। আর দেখাইয়া দিলেই যে সকলে শিক্ষা করিতে পারে, তাহাও নয়। কচিৎ কেহ কেহ শিক্ষা করিতে কৃতকার্য্য হয়; কারণ ইহাতে নানা প্রকার ব্যাঘাত আছে, তবে সদ্‌গুরু সহায় থাকিলে সকল বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়।

গুরুও যে, সে শিষ্যকে যোগে দীক্ষিত করেন না. অনেক পরীক্ষা করিয়া যদি যোগে দীক্ষিত হইবার উপযুক্ত মনে করেন তবেই দীক্ষা দেন, নচেৎ নয়। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে ভারতবাসীর নিকটেই জার্ম্মাণজাতি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিল; তাঁহারা পার্থিব উন্নতির বিষয় সকল শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু যোগ শিক্ষার উপযুক্ত নয় বলিয়া জার্ম্মাণ জাতিকে যোগ শিক্ষা দেন নাই। এক ভারতবাসী হিন্দু ব্যতীত, আর কাহারও কাছে যোগবিদ্যা শিক্ষা করিবার উপায় নাই। অদ্যাবধি জগতে আর কোন জাতিই যোগের গূঢ় রহস্য শিক্ষা করিতে পারে নাই, যদি দৈবাৎ কেহ শিক্ষা করিয়া থাকেন, তবে তিনি কোন হিন্দু সাধুর নিকটেই শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। সুতরাং জার্ম্মাণ জাতি যোগ শিক্ষা করিবে কোথা হইতে? পূর্ব্ব বর্ণিত জার্ম্মাণ ডাক্তার যে মহাত্মার নিকট যোগবিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে আপনি মাংসাশী ও মদ্যপায়ী, সুতরাং আপনি যোগ শিক্ষার উপযুক্ত নয়, সেই কারণে আপনাকে যোগ বিদ্যায় দীক্ষিত করিতে পারিব না।

আজকাল যোগশাস্ত্রের যে সকল বাঙ্গালা অনুবাদ দেখা যায় তাহা ঠিক নয়, আর ঠিক অনুবাদ করিবার উপায়ও নাই। কারণ প্রকৃত কর্ম্মী ব্যতীত কাহারও যোগ শাস্ত্র বুঝিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং যাহারা যোগী নয় তাহারা কেমন করিয়া সঠিক অনুবাদ করিবে? বাটীর চৌবাচ্চায় সাঁতার শিক্ষা করিয়া নদীতে বা পুষ্করিণীতে সাঁতার দিতে যাওয়া যেমন বাতুলের কার্য্য, সেইরূপ ব্যাকরণের সাহায্যে যোগশাস্ত্র পাঠ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ করাও তদ্রূপ। কেবল যোগশাস্ত্রই যে এইরূপ কঠিন তাহা নয়। আমাদের সকল শাস্ত্রই এরূপ ভাবে লেখা যে, ব্যাকরণের সাহায্যে তাহা পাঠ করিয়া, তাহার গূঢ় অর্থ বুঝা অসম্ভব। যোগ অভ্যাস করিয়া যাঁহারা সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ বুঝিতে সক্ষম। অপরে নহে। জার্ম্মাণ জাতির জ্ঞান বুদ্ধি সূক্ষ্ম নয় বলিয়া, হিন্দু সাধু মহাত্মারা তাঁহাদিগকে যোগশিক্ষা দেন নাই কেবল সংস্কৃত ভাষা আর পার্থিব উন্নতির কৌশল সকল শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভারতে এখনও যে সকল যোগী ঋষি প্রচ্ছন্নভাবে আছেন, তাঁহারা কখনই অন্য জাতিকে যোগশিক্ষা দিবেন না, ইহা নিশ্চিত। সেই জন্য অদ্যাবধি কোন জাতিই যোগ শিক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। আর অন্য কোন জাতিও সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারে নাই। কচিৎ কেহ কখন

ভারতবাসীর কাছে শিক্ষা করিয়া থাকিবে। যখন অন্য কোন দেশে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার উপায় নাই, তখন ইহা নিশ্চিত যে জার্ম্মাণ জাতি ভারতবাসীর কাছেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিল। এবং জার্ম্মাণ জাতি যোগ শিক্ষার উপযুক্ত নয় বলিয়া ভারতবাসীরা তাঁহাদিগকে যোগ শিক্ষা দেন নাই, কিন্তু অন্য অন্য বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রকৃতিদেবী অসীম করুণা পরবশ হইয়া তাঁহার প্রথম সৃষ্টি নিজাকৃতি দেশে এবং সেই দেশের লোকের নিকট এই দুর্লভ যোগ রত্ন নিহিত রাখিয়াছেন। কেহই ইহাকে এই প্রকৃতিরূপা দেশ হইতে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে না, ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

ভারত হইতে কোন কোন সাধু মহাত্মা যে অন্য অন্য দেশে গিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা একটী কাহিনী বলিব। তাহা কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না, কেবল সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা কোন সাধুর মুখে যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই এ স্থলে ব্যক্ত করিতেছি। সেই সাধু মহাত্মা বলেন যে ওল্ড টেস্‌টামেণ্ট নামক ধর্ম্ম পুস্তক বাইবেলখানি একজন হিন্দু সাধু কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। ওল্ড টেস্‌টামেণ্টে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা প্রায় সমস্তই গীতার অনুকরণে লেখা হইয়াছে। ওল্ড টেস্‌টামেণ্ট গীতার ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রন্থ। ইহাতে অতি উৎকৃষ্ট উপদেশ সকল লিখিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সকল উপদেশের গূঢ় অর্থ অধিকাংশ ওল্ড ও নিউ টেস্‌টামেণ্টের ধর্ম্মাবলম্বীগণ বুঝিতে পারেন না। ইহার কারণ এই যে গ্রন্থখানি সাধু মহাত্মার দ্বারা রচিত হইয়াছে। সাধুর ভাষা সাধুর ন্যায় সূক্ষ্ম বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলেই বুঝিতে পারিবে, অন্যের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। যেমন গীতা ও অন্য অন্য শাস্ত্রাদির গূঢ় অর্থ আমরা বুঝিতে অক্ষম, ইহাও তদ্রূপ। ওল্ড টেস্‌টামেণ্টখানির রচয়িতার নাম মোজেস্, ইনি একজন হিন্দু সাধু ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল মৎস্যানন্দ স্বামী। তিনি গুরু আদিনাথের শিষ্য। আদিনাথ সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার নিকট মৎস্যানন্দ দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সাধন দ্বারা বিশেষ উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আত্মবিস্মৃতি হইয়া অথবা পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফলে, তিনি এক রজকীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, এবং তাহাকে লইয়া ভারতের এক নিভৃত স্থানে যাইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। মৎস্যানন্দের এক শিষ্য ছিল, তাহার নাম গোরক্ষনাথ। তিনি মৎস্যানন্দের নিকট উপদেশ পাইয়া অদম্য অধ্যবসায় সহিত, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর

পতন এই পণ করিয়া যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রায় সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলেন। এই সময় তাঁহার গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হইল। তিনি গুরুদেবের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। নানা স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে সেই নিভৃত স্থানে যাইয়া গুরুদেবের সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি গুরুদেবকে রঙ্গকীর সহিত বাস করিতে দেখিয়া একবারে স্তম্ভিত হইলেন। বুঝিলেন গুরুদেবের পতন হইয়াছে। ভক্ত শিষ্য মনে মনে ভাবিলেন গুরুদেবের এই অবস্থা তাঁহার দেখা উচিত নয়। যেমন করিয়া হউক এই অবস্থা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এই বিষয় মনে মনে স্থির ..., একদিন গোরক্ষনাথ গুরুর সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, প্রভো! এ কি আপনি দেবত্ব লাভ করিয়া এখন এই নরকে বাস করিতেছেন? আপনি সকলই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন! আমি আপনার অধম শিষ্য আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছি যে আপনি কি ছিলেন, আর এখন কি হইয়াছেন! এই সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিস্থ হউন, এই আমার নিবেদন। এই কথা শুনিবা মাত্র মৎস্যানন্দের চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন বৎস! আমার মতিভ্রম হইয়াছিল, তাই আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম. এখন আমার চৈতন্য হইয়াছে। আমি যথেষ্ট পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, এইবার তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি এই দেশ হইতে চলিলাম, তুমি আর আমার দর্শন পাইবে না। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যেখানে সাধন ভজন করিতে সেইখানে যাইয়া সাধন ভজন করগে, তুমি শীঘ্রই সিদ্ধাবস্থা পাইবে। তোমার যশ চারিদিকে প্রচার হইবে। ইহার পর একদিন তিনি রঙ্গকীর অজ্ঞাতসারে ভারত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি পেলেস্‌টাইন দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সেইখানে মোজেস্ নাম ধারণ করিয়া একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ইহার পূর্ব্বেই উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহার মতিভ্রম হওয়াতে তাঁহার পতন হইয়াছিল, এই মাত্র, এই জন্য অতি অল্প দিনের মধ্যেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিলেন। এই সময় তিনি হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিলেন। সাধুদিগের কিছুই শিক্ষা করিতে বিলম্ব হয় না, কারণ যোগ সাধন দ্বারা তাঁহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও দৃষ্টি সকলেই সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হয়। তিনি হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিয়া গীতার অনুকরণে এই ওল্ড টেস্‌টামেণ্টখানি

রচনা করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। ইহাতেই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি বিদেশে যাইয়া বিদেশীয় নাম ধারণ করিয়া, বিদেশীয় ভাষায় ধর্ম্ম পুস্তক লিখিয়া জগদ্বিখ্যাত হইলেন, কিন্তু যে ভারত মাতার ক্রোড়ে তিনি লালিত পালিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার গৌরব বৃদ্ধির জন্য তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না; ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? যাহা হউক, অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইলেই প্রচ্ছন্ন থাকে নচেৎ যে স্থানেই থাকুক সেই স্থানই আলোকিত করিবে। মৎস্যানন্দ স্বামী ভারতে ভস্মাচ্ছাদিত ছিলেন, পেলেস্টাইন দেশে যাইয়া তাঁহার জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া, সেই দেশের লোকের অজ্ঞান তিমির নাশ করিয়াছিল।

পরেশনাথ দেব জৈনদিগের উপাস্যদেবতা। সাধুরা বলেন, পরেশনাথ দেব মৎস্যানন্দ স্বামীর ঔরসজাত পুত্র। স্বামীজি ভারত পরিত্যাগ করিবার সময় তিনি অত্যন্ত শিশু ছিলেন। পরে বয়প্রাপ্ত হইলে তিনিও কোন সাধুর নিকট উপদেশ পাইয়া সাধন ভজন দ্বারা উন্নত অবস্থা লাভ করিয়া অনেক শিষ্য সেবক করিয়াছিলেন। জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার অত্যন্ত ভক্ত, তাঁহারা পরেশনাথ দেবকে উপাস্য দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। সেই জন্য পরেশনাথ দেব অদ্যাবধি ভারতে চিরস্মরণীয় ও পূজনীয় হইয়া রহিয়াছেন।

গোরক্ষনাথ গুরুদেবের প্রস্থানের পর স্বস্থানে আসিয়া সাধন ভজন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকিলেন। "গোরক্ষনাথ" নামটী তাঁহার গুরুদত্ত নাম। ইহার সাধারণ অর্থ গরুর রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব সে অর্থে তাঁহাকে এই নাম দেন নাই। ইহার গূঢ় অর্থ এই, 'গো' অর্থে জিহ্বা, 'রক্ষ' অর্থে রাখা বা স্থাপন করা, আর 'নাথ' অর্থে কর্ত্তা, যিনি করেন। অর্থাৎ যিনি জিহ্বাকে যথাস্থানে স্থাপন করিতে সক্ষম হন, তিনিই "গোরক্ষনাথ" পদবাচ্য। জিহ্বাকে তালু কুহরে প্রবৃষ্ট করাইয়া তদূর্দ্ধে স্থাপন করিলে মস্তকাস্থিত সহস্রার পদ্ম হইতে অমৃত নিঃসৃত হইয়া জিহ্বাতে আসিয়া পতিত হয়, সেই অমৃত পান করিলে মনুষ্য অমরত্ব লাভ করে। গুরু সেই কৌশল দেখাইয়া দেন। গোরক্ষনাথ সেই কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এই কারণে গুরুদেব তাঁহার নাম দিয়াছিলেন "গোরক্ষনাথ"। যাহা হউক গোরক্ষনাথ সাধন

ভজনের দ্বারা শীঘ্রই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার নাম চারিদিকে প্রচারিত হইল। তাঁহারও অনেক শিষ্য সেবক হইল, এবং তিনি একজন পরম সাধু বলিয়া গণ্যমান্য হইলেন। তিনি যেস্থানে বাস করিতেন শিষ্য-সেবকগণ সেই স্থানের নাম দিয়াছিলেন "গোরক্ষপুর"। সেই গোরক্ষপুর বর্ত্তমান কালে গোরকপুর নামে পরিচিত হইয়াছে। গোরক্ষনাথের শিষ্য সম্প্রদায় ইদানীঃ "গোরকপন্থি" নামে পরিচিত। গোরকপন্থি সম্প্রদায় অদ্যাবধি উত্তর পশ্চিম ভারতে বর্ত্তমান আছে।

আমরা মৎস্যানন্দ স্বামীর কাহিনী বলিতে বলিতে অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। যাহা হউক সেই কাহিনী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অন্য অন্য সিদ্ধ পুরুষগণও যে অন্য অন্য দেশে যান নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ অনেক সিদ্ধপুরুষ জার্ম্মাণীতেও গিয়াছিলেন, এবং তথায় যাইয়া জার্ম্মাণদিগকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিয়া বিজ্ঞানের কার্য্য সকল নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং তাহারই ফলে জার্ম্মাণ জাতি নানাপ্রকার বিজ্ঞানের কার্য্য কৌশল জগতে দেখাইতেছেন, এবং তাঁহাদের দেখাদেখি অন্য অন্য জাতিও সেইরূপ অনুকরণ করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে দেশে এই সকল মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর যে দেশে এই সকল অমূল্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সেই দেশের লোক সর্ব্বস্ব হারাইয়া দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করিয়া, আজ সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর অবনতি কি আছে? আমরা বলি প্রকৃতিরূপা নারী নির্য্যাতনের এই ফল। ইহা ভগবৎবাণী পূর্ণ হইতেছে। নিয়তি কে খণ্ডন করিতে পারে?

"মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যু রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জগতের অন্য অন্য জাতি যে কোন প্রকারেই জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া উন্নতি লাভ করিয়া আমাদের মোহিত করুন না কেন, তাহা এখন আমাদের চর্চ্চা করা বৃথা ; তবে আমাদের যে অধঃপতন হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। আর সেই পতন কোন সময় এবং কি প্রকারে হইয়াছে তাহাও আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। ভারত যে এই অবস্থা হইতে আর কখন সেই পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিবে তাহা অনুমান হয় না। না হইবার আর একটী কারণ এস্থলে উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হওয়া অনুচিত বোধে সেই কারণটী উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। ভারতের অমূল্য গ্রন্থ সকল প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তখনও যাহা কিছু ভারতের স্থানে স্থানে বর্ত্তমান ছিল, আর্য্যগণ সেই সকল নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া সোমনাথের মন্দিরে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সকল গ্রন্থের সহায়ে তাঁহারা অল্পে অল্পে উন্নতি সাধন করিতেছিলেন। তখনও ভারতবাসী অন্য অন্য জাতি অপেক্ষা ধন, ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞান বিজ্ঞানে, শৌর্য্যে বীর্য্যে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই কারণে মোগোল পাঠান জাতির লোলুপ দৃষ্টি ভারতের উপর পড়িল। ভারতের শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য হরণ করিবার মানসে তাঁহারা একে একে ভারত আক্রমণ করিয়া ভারতবাসীকে পরাভূত করিলেন। কেবল হিন্দু জাতিকে পরাভূত করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না। যাহাতে হিন্দু জাতি আর কখন উন্নতি করিয়া ভবিষ্যতে মস্তক উত্তোলন করিতে না পারে, সেই অভিপ্রায়ে জাতীয় গৌরব, সোমনাথের মন্দিরে রক্ষিত সেই অমূল্য গ্রন্থ সকলে, (যাহার বলে হিন্দু জাতি এক সময় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল) আগ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়া একবারে ভস্মীভূত করিয়া দিলেন। জাতীয়

উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। গ্রন্থের সহায়েই উন্নতি হইয়া থাকে, সেই কারণে সেই সকল অমূল্য গ্রন্থ ভস্মসাৎ করিয়া হিন্দুজাতিকে অধঃপতনের চরম সীমায় আনিয়া ফেলিলেন। সুতরাং এখন আর পূর্ব্বাবস্থা লাভের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা আবার এই অবস্থাতে স্বাধীনতা পাইবার জন্য, সভা সমিতি করিয়া বক্তৃতার ছড়াছড়ি করি। সম্বাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখি, কিন্তু আমরা এটা ভাবি না যে যাঁহারা আমাদিগকে স্বাধীনতা দিবেন, তাঁহাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য যাহা কিছু হইয়াছে তৎসমস্তই ভারতের স্বাধীনতা হরণ করিয়াই হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে তাঁহাদের এত ঐশ্বর্য্য ছিল না। সেই ভারতকে তাঁহারা স্বাধীনতা দিবেন ইহা কি সম্ভব হয়? ভারতকে স্বাধীনতা দিলে তাঁহাদের আর কি থাকিবে? তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদন কেমন করিয়া চলিবে? তাঁহারা অন্নাভাবে মারা যাইবেন। সুতরাং তাঁহারা যে কোন কালেই ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিবেন না, তাহা আমরা আমাদের বিকৃত বুদ্ধিতে বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না, অথবা বুঝিতে চাহি না। তাঁহারা এখানে আদায় করিতে আসিয়াছেন, আদায় দিতে আসেন নাই। যাহা কিছু দেন তাহা কেবল মাত্র দাসত্বের বেতন স্বরূপ। তাহাও এত সামান্য যে তাহাতে ভারত-বাসীর আজকালকার দিনে দিনপাত করা একবারে অসম্ভব। তাহাও আবার সকলের ভাগ্যে মিলে না। সুতরাং তাহারা অন্নাভাবে রোগে শোকে ভুগিয়া ভুগিয়া মারা যায়। কিন্তু যদি তাঁহারা আমাদিগকে একেবারেই নাই দেন, তাহাতেই বা আমাদের কি করিবার ক্ষমতা আছে? আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে দাসত্বের অষ্টপাশে বদ্ধ, নাড়িবার চড়িবার ক্ষমতা নাই. তাঁহারা প্রথমতঃ স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিবেন, তাহার পর যাহা কিছু পারেন দয়া করিয়া আমাদের জন্য করিবেন। ইহাতে আমরা যদি অসন্তুষ্ট হই তাহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ তাঁহাদের ক্ষতি করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমাদের আছে কেবল কলমের জোর আর কণ্ঠের জোর। এই দুই অস্ত্রে ইংরাজ জাতি ভয় পাইবার জীব নহে। আর এই দুই অস্ত্র ব্যতীত যদি আমরা অন্য কোন অস্ত্রের সাহায্য লই, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদিগকে পদতলে দলিত এবং মথিত করিয়া ফেলিবে। তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং আমাদের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন তাঁহাদের সহিত বৃথা বাকবিতণ্ডা না করিয়া তাঁহারা দয়া করিয়া যাহা কিছু

দেন তাহাই হাস্যবদনে লওয়া উচিত। তবে আমাদের কষ্টের কথা, দুঃখের কথা; আবেদন, নিবেদন এবং উপরোধ, অনুরোধ করিয়া যাহা কিছু পাই তাহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবে, কারণ আমরা সম্পূর্ণ রূপে পঙ্গু, আমাদের কোন ক্ষমতা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, যদি ইংরাজ আমাদের স্বাধীনতাই দেন, তাহা হইলেই কি আমরা আমাদের দেশ অপর জাতির আক্রমণ হইতে এখন রক্ষা করিতে পারি? কখনই নয়। পূর্ব্বে যদি তাহা আমরা পারিতাম, তাহা হইলে আজ আমরা পরাধীন হইতাম না। পূর্ব্বের অবস্থা অপেক্ষা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা অনেক মন্দ হইয়াছে, সুতরাং যাহা পূর্ব্বে পারি নাই এখন তাহা কেমন করিয়া পারিব? আমাদের দেশে যে সকল রাজা মহারাজা আছেন তাঁহাদের অবস্থা কি? যে সকল রাজা মহারাজা চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের আচার ব্যবহার একবারেই প্রশংসনীয় নহে। দেশের যাঁহারা নরপতি বলিয়া গণ্য মান্য, তাঁহারা যদি ক্ষীণ বুদ্ধি এবং হীনবল ও কুপথগামী হন, তাহা হইলে সাধারণ লোকের নিকট আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? যে দেশের রাজা প্রজা সকলেই কুপথ এবং বিপথগামী হয়, সে দেশের কি কখন উন্নতি হইতে পারে? না দেশ কখন স্বাধীন হয়? যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা পুরাকালের মুনি ঋষিদিগের উপদেশ অনুসারে চলিতে পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের উন্নতি বা স্বাধীনতা লাভ আশা করা দুরাশা মাত্র। ইংরাজ জাতির এখন একাদশ বৃহস্পতির দশা। তাঁহাদের হস্ত হইতে ভারতকে কাড়িয়া লইতে পারে এরূপ রাজশক্তি তো বর্ত্তমান কালে দৃষ্টিগোচর হয় না। আর যদিও কোন প্রকারে কোন রাজশক্তি তাহা করিতে সমর্থ হয়, তাহাতেই বা আমাদের লাভের এবং সুখের আশা কোথায়? যে কোন রাজশক্তি ভারতে আসুন না কেন, কেবলই আদায় করিতে আসিবেন। আদায় দিবার জন্য আসিবেন না ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। আমাদের মঙ্গল কিছুতেই নাই।

স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অধীন রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন সম্বন্ধে কি ইংরাজ, কি অন্য জাতি, সকলেরই এক প্রকার নিয়ম ও পদ্ধতি। ছলে, বলে, কৌশলে কেবলই আদায় করিবার উদ্দেশ্য, আর কোন কথা নাই। ইহাতে যদি সেই অধীন জাতি কথা কহে কিম্বা হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে আর সে জাতির নিস্তার নাই। আর

ইংরাজ অপেক্ষা অধিক ন্যায়পরায়ণ রাজা বা রাজশক্তি বর্ত্তমানে তো পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। সকলেই যেন এক ছাঁচে নির্ম্মিত। যখন সকল রাজশক্তির নিয়ম পদ্ধতি একই প্রকার, তখন অন্য কোন রাজশক্তি আসিলে আমাদের লাভ কি? বরং ইংরাজ অনেক অংশে ভাল। আর ইংরাজ এখান হইতে যাইবার পূর্ব্বে ভারতকে শ্মশানে পরিণত করিয়া যাইবে। নর শোণিতে ভারত রঞ্জিত হইবে। মৃতদেহ পচিয়া সোণার ভারত দ্বিতীয় নরকে পরিণত হইবে। আমাদের দুর্দ্দশার একশেষ করিয়া যাইবে। তখন আমরা উন্নতির পথ হইতে শত বৎসরেরও অধিক পিছাইয়া যাইব। আমরা অন্নের জন্য কাঙ্গাল হইয়া বেড়াইব। সুতরাং ইংরাজ এখানে থাকাই আমাদের মঙ্গল। কারণ ইংরাজ আমাদের চিনিয়াছেন, আমরাও তাঁহাদের চিনিয়াছি। আমরা অনেক দিন হইতে তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবসা ও বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহাদের ভাষা এবং আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া তাঁহাদের সহিত বেশ মেলামেশা করিতেছি। এখন অন্য কোন জাতি এখানে আসিলে, তাহাদের ভাষা এবং তাহাদের আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া, তাহাদের সহিত মেলামেশা এবং তাহারাও আমাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি শিক্ষা করিয়া, আমাদের সহিত মিলিয়া সুচারুরূপে রাজ্য শাসন করিতে অনেক সময় লাগিবে। ততদিনে ভারত শ্মশানে পরিণত হইবে। সুতরাং আমরা ইংরাজের প্রস্থান প্রার্থনা না করিয়া তাঁহাদের অবস্থানের জন্যই প্রার্থনা করা উচিত। যাঁহারা মনে করেন ইংরাজের পরিবর্ত্তে অন্য কোন রাজশক্তি আসিয়া ভারত অধিকার করিলে আমরা সুখে থাকিব, তাঁহারা বাতুল। যদি আমরা কখন উন্নতি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে ইংরাজের সাহায্যেই পারিব, নচেৎ আর কাহারও সাহায্যে পারিব না। যাহা হউক এ বিষয় লইয়া অধিক আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা উচিত, কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারি।

আমরা বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি তাহা হইতে স্বাধীনতা বা উন্নত অবস্থা লাভ করা, অসম্ভব না হইলেও সহজ নয় ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সেই আশঙ্কায় কি আমাদের নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা উচিত? কখনই নয়। স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবার জন্য আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত এবং তাহার উপায়ও অনুসন্ধান করা উচিত। এক্ষণে আমরা স্বাধীনতা বা

স্বরাজ পাইবার জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতেছি তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা। সেই সকল উপায় দ্বারা আমরা কোন কালেই কৃতকার্য্য হইব না, বরং বিপরীত ফল পাইব। তবে কোন্ পথ অবলম্বন করিলে আমরা কৃতকার্য্য হইব তাহা আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে। অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাদের কোথাও যাইতে হইবে না, তাহা আমাদের দেশেই আছে। আমরা বলি যে উপায় অবলম্বন করিয়া ভারতবাসী এক সময় উন্নতির উচ্চতম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই উপায়। প্রকৃতিরূপা ভারতমাতা, তাঁহার অসীম কৃপায় তাঁহার অভিশপ্ত সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য আজিও সেই উপায় তাঁহার বক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। আর কোথাও যাইতে দেন নাই। আমরা মনে করিলেই তাহা লইয়া তাহার সাধন দ্বারা জগতের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারি। সে উপায়টী কি? সেটীর নাম যোগবিদ্যা। যাহা শিক্ষা করিলে জ্ঞান, বিজ্ঞান, বুদ্ধি করতলস্থ হয়। যাহা সাধন করিলে জগতে আর কোন কিছু জানিবার বা শিখিবার অবশিষ্ট থাকে না। আমরা সেই উপায়ের কথা বলিতেছি। কিন্তু সেই যোগের কথা শুনিলেই আমরা বলিয়া থাকি যোগ সাধন করিলে উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণ নাশ হয়। এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

গীতা ২ অঃ ৪০ শ্লোক।

অর্থাৎ এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রারম্ভের বিফলতা নাই, প্রত্যবায় (বিঘ্ন) নাই, এই ধর্ম্মের অল্প মাত্রও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে।

যাঁহাদের প্রকৃত গুরুলাভ হয় নাই, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যোগ সাধনে উৎকট ব্যাধি হইয়া প্রাণ নাশ হয়। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা পাইলে, কোন ব্যাঘাত বা ব্যাধি হয় না। যাঁহারা যোগ সম্বন্ধে কিছু জানেন না তাঁহাদের কাছে দীক্ষিত হইলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সেই কারণে যোগের দোষ দেওয়া অজ্ঞতার পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাঁহারা যোগে দীক্ষা পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের গুরু চিনিয়া লইতে হইবে, সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা পাইলে কোন বিপদ নাই। তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

সদ্গুরু পাওয়ে ভেদ্ বাতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ্।
তও কয়্লা কি ময়্লা ছোটে, যও আগ্ করে পরবেশ্॥
দোঁহাবলি ৫২।

যোগপথ অবলম্বন করিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহারা ভণ্ড। বনে গিয়া ব্রহ্মচর্য্য হয় না ইহা নিশ্চিত। পুরাকালের মুনি ঋষিগণ সংসারে থাকিয়াই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সাধন ভজন করিতেন। তাঁহারা সংসারে থাকিয়াই সংসার জয় করিয়া সিদ্ধ মুক্ত হইয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অতএব আমরাও ইচ্ছা করিলে অক্লেশে যোগাভ্যাস করিতে পারি; ইহাতে কোন ব্যাঘাত নাই। কিন্তু আমাদের আর একটী কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক, তাহা এই যে, ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অঙ্গ শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখা। অর্থাৎ অযথা শক্তি ক্ষয় না করা। শক্তি কি তাহাও আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। শুক্র ধাতুই জীবের শক্তি। সেই শুক্রের অযথা ব্যয় না করা। শুক্রের অযথা ব্যয় করিলে ব্রহ্মচর্য্য নিস্ফল হয়। শুক্র ধাতুই বা কি, তাহাও আমাদের জানিয়া রাখা উচিত। পঞ্চভূতোদ্ভব শস্যাদি, ফল, মূল ও দুগ্ধ ঘৃতাদি ভক্ষণ করিয়া আমাদের শরীরে যে পাঁচপ্রকার রসের সঞ্চয় হয়, তাহারই সমষ্টি শুক্র ধাতু। আর এই শুক্র ধাতুই প্রাণের ঘনীভূত অবস্থা; ইহাতে চৈতন্য শক্তি সংযুক্ত হইয়াই জীব উৎপন্ন হয়। সুতরাং শুক্র ধাতুই জীবের প্রাণ। শাস্ত্রে উক্ত আছে 'শুক্র ধাতু ভবেৎ প্রাণ', অর্থাৎ শুক্রধাতুই প্রাণ। সেই প্রাণের অপব্যয় করাই পাপ। এবং সেই পাপের ফলস্বরূপ, রোগ, শোক ভোগ করিয়া মনুষ্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া নর পশুতে পরিণত হয়, এবং সকল কার্য্যই পশুবৎ করিয়া, পশুবৎ বিচরণ করিয়া থাকে। সেই শুক্ররূপী প্রাণের ক্ষয় নিবারণ করিয়া যোগ সাধন করিলে আমরা দেবতায় পরিণত হইব। এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান, বল বুদ্ধি লাভ করিয়া ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের ন্যায় জগতে অজেয় হইব। সুতরাং প্রাণের পূজা করাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এবং যে ক্রিয়া দ্বারা প্রাণের সম্বর্দ্ধনরূপ পূজা করিতে হয় সেই ক্রিয়ার নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়াম শব্দে বুঝিতে হইবে প্রাণের আয়াম, অর্থাৎ প্রাণের বিস্তার। ইহা

সদ্‌গুরু ব্যতীত শিক্ষা করিবার উপায় নাই, কারণ ইহা গুরুমুখী বিদ্যা। পুস্তক পাঠ করিয়া ইহা শিক্ষা করা যায় না, পুস্তকে যেরূপ লেখা আছে তাহা ঠিক নয়। সেইরূপ প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণ নাশ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যোগশাস্ত্র প্রকৃত কর্ম্মী ব্যতীত অপর কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই। যোগশাস্ত্রের যে বাঙ্গালা অনুবাদ আছে, তাহা প্রকৃত কর্ম্মীর দ্বারা কৃত নয়, সুতরাং ঠিক হওয়াও সম্ভব নয়।

ফুল তুলসী দিয়া দেবদেবীর পূজা করা অপেক্ষা প্রাণের পূজায় সহস্র গুণ ফল পাওয়া যায়, সদ্যই ফল পাওয়া যায়, ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। দেবদেবীর পূজার ফল অনিশ্চিত। সুতরাং প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর প্রাণের পূজা করা কর্ত্তব্য। আমাদের পূজা পদ্ধতিতে যে সকল মন্ত্র ব্যবহার করা যায় তাহা সকলই প্রাণের পূজার মন্ত্র। আমরা তাহার অর্থ বুঝি না, আর ঠিক ভাবে করিতেও জানি না, সেই জন্য কোন ফলও পাই না। প্রাণের পূজায় ফুল তুলসী আবশ্যক হয় না। প্রাণের পূজা প্রাণের দ্বারাই হয়, অন্য কিছুতে হয় না। যেমন গঙ্গাপূজা কেবল গঙ্গাজলেই হয়, অন্য কোন জলে হয় না, তদ্রূপ প্রাণের পূজা প্রাণের দ্বারাই হয়। প্রাণের পূজারূপ সম্বর্দ্ধনা করিলে প্রাণই বন্ধু হইয়া আমাদিগকে পরম মঙ্গলময় পথে লইয়া যাইবেন। জগতে এক প্রাণ ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব দেখা যায় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে ক্রিয়া দ্বারা প্রাণের পূজা করিতে হয়, তাহাকে প্রাণায়াম বলে। সেই প্রাণায়াম দ্বিবিধ। অন্তঃ প্রাণায়াম আর বহিঃ প্রাণায়াম। অন্তঃ প্রাণায়ামে মনুষ্যের জ্ঞান বিজ্ঞান বিকশিত হয়। বহিঃ প্রাণায়ামে তাহা হয় না। প্রাণায়াম অষ্টাঙ্গ যোগের একটী প্রধান অঙ্গ। প্রাণায়ামের পূরক, রেচক, কুম্ভক, যাহা যোগশাস্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদে লেখা আছে, তাহা ঠিক নয়। গুরু ব্যবসায়ী গুরুর কাছে ইহা শিক্ষা করিয়া অভ্যাস করিলে, উৎকট পীড়া ও পরিশেষে প্রাণনাশ অনিবার্য্য। সুতরাং কেহ যেন ইহা না করেন। যিনি যোগে দীক্ষা পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে প্রথমে গুরু চিনিয়া লইতে হইবে। যদি তিনি চিনিতে অসক্ত হন, তাহা হইলে গুরুকে পরীক্ষা করিবার একটী উপায় বলিতেছি, সেইটী স্মরণ রাখিলেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবেন। যে গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দিয়া শিষ্যের দেহের মধ্যে সেই পরাশক্তির রূপ দেখাইতে পারিবেন, তিনিই সদ্‌গুরু বুঝিতে হইবে, এবং তাহার উপদেশ মত সাধন ভজন করিলে

যোগ ঐশ্বর্য্য লাভ হইবে। নচেৎ গুরু শিষ্যের কানে কানে, চুপি চুপি বলিলেন "শ্রীং" অথবা "শ্রী" এই মন্ত্র তুমি জপ করিবে, তাহা হইলে তুমি চতুর্বর্গ ফল লাভ করিবে। কিন্তু ইহা কেবল সন্তোষ বাক্য মাত্র। ইহা লক্ষ বৎসর জপ করিলেও কোন ফল হইবে না। অবশ্য এই সকল মন্ত্র অশেষ শক্তিশালী; যেমন একটী ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ অতি সূক্ষ্মাকারে নিহিত থাকে ইহাও তদ্রূপ। এই সকল বীজ মন্ত্রের মধ্যে অতি গুরুতর বায়ু ক্রিয়া নিহিত আছে। সেই সকল বায়ু ক্রিয়া দ্বারা উক্ত মন্ত্র সকলের চৈতন্য সম্পাদন করিতে হয়, তবে ঐ সকল মন্ত্র শক্তিশালী হইয়া সাধকের অভীষ্ট ফল প্রদান করে, নতুবা কেবল মুখে আবৃত্তি করিলে কোন কালেই ফলবতী হয় না। "শ্রী" মন্ত্রের গূঢ় অর্থ কি, এবং কিরূপ ক্রিয়া দ্বারা "শ্রী" মন্ত্রের চৈতন্য সাধন করিতে হয়, আর চৈতন্য সাধন করিলে সাধকের কি অবস্থা লাভ হয়, সেই গুহ্য বিষয় পাঠকের অবগতির জন্য ব্যক্ত করিতেছি। "শ্রী" শব্দে তিনটী বর্ণ আছে, শ, র, ঈ। শ অর্থে শিব, অর্থাৎ প্রাণ, যিনি প্রত্যেক জীবদেহে বিরাজ করিতেছেন। র অর্থে বহ্নি বীজ, যাহা প্রত্যেক জীবের চক্ষে প্রকাশ। আর ঈ অর্থে শক্তি। ইহাতে ইঙ্গিতে সংক্ষেপে এই বলা হইয়াছে যে, শক্তিপূর্ব্বক প্রাণকে লইয়া চক্ষে ধারণ কর। প্রাণকে কি প্রকারে চক্ষে ধারণ করিতে হয় তাহা এই—যৌগিক ক্রিয়া দ্বারা প্রাণকে সুষুম্না পথে লইয়া গিয়া শক্তিপূর্ব্বক ষট্‌পদ্ম ভেদ করিয়া চক্ষে স্থাপন করিতে হয়। সেই রূপ করিলে জীবের আত্মদর্শন হয়। কারণ প্রাণই দেখে, চক্ষু দেখে না। চক্ষু দেখিবার যন্ত্র মাত্র। আত্মদর্শন লাভ হইলে জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে। প্রাণকে চক্ষে ধারণ করিলে সাধকের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা মহাদেবের মূর্ত্তিতে দেখান হইয়াছে। দেবাদিদেব মহাদেব ভাঙ্গ সিদ্ধি পান করিয়া নেশাতে যে চক্ষু যুগলের তারা উল্টাইয়া বসিয়া আছেন তাহা নহে। তিনি ব্রহ্মাবলোকন করিতে করিতে তন্ময় হইয়া আছেন। দেহরূপ জগতের ও বহির্জগতের অস্তিত্ব তাঁহার কাছে লোপ হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রাণকে পঞ্চতত্ত্বের অতীত স্থানে রাখিয়া তত্ত্বাতীত নিরঞ্জনের সহিত মিশিয়া রহিয়াছেন। ইহাই মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তিতে দেখান হইয়াছে। সাধক এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যখন স্থায়ীরূপে প্রাণকে চক্ষে ধারণ করিতে সক্ষম হন, তখনই তিনি মুক্তি লাভ করেন। গুরু শিষ্যকে যখন "শ্রী" মন্ত্র দান করেন, তখন "শ্রী" মন্ত্রের গূঢ় অর্থ বুঝাইয়া দিয়া তাহার কার্য্যগুলি শিষ্যের সম্মুখে

নিজে করিয়া শিক্ষা দিতে হয়। শিষ্য সেইরূপ শিক্ষা করিয়া তবে তাহার ফললাভ করিয়া থাকে। নচেৎ কেবল মাত্র মুখে আবৃত্তি করিলে কোন ফল হয় না। যিনি সদ্‌গুরু তিনিই কেবল মন্ত্র সকলের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারেন, অন্যে নহে। এইরূপ গুরুই প্রকৃত গুরু। এইরূপ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে, এবং তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী সাধন ভজন করিলে, সাধক যোগ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন।

সেই যোগ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আমরা যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভীম অর্জ্জুনের ন্যায় পুত্র আর সীতা সাবিত্রীর ন্যায় কন্যা উৎপন্ন করিতে পারি, তাহা হইলেই আবার আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব, নচেৎ নয়। স্বাধীনতা লাভ করিবার এই পথই শ্রেষ্ঠ পথ। উক্ত প্রকার বীরপুত্র এবং সতীসাধ্বী কন্যা উৎপন্ন করিবার কৌশল সকল যোগ অভ্যাস করিলে জানিতে পারা যায়, মুনিঋষিগণ সর্ব্বদাই পরমাত্মায় যুক্ত হইয়া তন্ময় হইয়া থাকিতেন, এবং সেই অবস্থাতে জীবের মঙ্গলের জন্য নানা শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কৃত শাস্ত্রাদি অভ্রান্ত, এবং সেই সকল শাস্ত্রাদিতে অনেক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। যোগশাস্ত্র তন্মধ্যে প্রধান। স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন—

> আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
> ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রং পরং মতম্॥
> যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি নিশ্চিতম্
> তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যঃ কিমন্যৎ শাস্ত্র ভাষিতম্॥

শিবসংহিতা ১৭।১৮ শঃ।

অর্থাৎ নিখিল শাস্ত্র দর্শনপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা একমাত্র স্থির নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যোগশাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ, এই শাস্ত্র জ্ঞাত হইলে অভ্রান্তরূপে সমস্ত তত্ত্বই বিদিত হওয়া যায়। সুতরাং এই যোগশাস্ত্রে পরিশ্রম করা সকলের কর্ত্তব্য, অন্য শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণে প্রয়োজন কি?

অতএব যাহাতে ভারতের প্রত্যেক হিন্দু নরনারী যোগ অভ্যাস করিয়া শাস্ত্র কথিত উপায় অবলম্বন করিয়া শৌর্য্য, বীর্য্যশালী পুত্র উৎপন্ন করিতে পারেন তাহা বিধিমতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অদ্য হইতে চেষ্টা করিলে

আমরা শত বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়া হিন্দুদিগের শৌর্য্য বীর্য্য এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিচয় দিয়া জগৎকে মোহিত করিতে পারিব। কেবল তাহাই নহে। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে সংসার আশ্রম আলোকিত এবং প্রতি ঘরে ঘরে শান্তি বিরাজ করিবে। দাম্পত্য সুখে সংসার আশ্রম মঙ্গলময় হইবে।

সকলের ভাগ্যে সদ্‌গুরু লাভ হয় না, সুতরাং সকলের ভাগ্যেও যোগশিক্ষা ঘটিয়া উঠে না, ইহা সত্য। কিন্তু যোগশিক্ষা ব্যতীত আর একটী উপায় আছে, যাহা দ্বারা আমরা শৌর্য্য, বীর্য্যশালী পুত্র এবং সতী সাধ্বী কন্যা উৎপন্ন করিতে পারি। সে উপায় গুলিও মুনিঋষিগণ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই পথ অবলম্বন করিলেও আমাদের অনেক উন্নতি লাভ হইবে। ঘরে ঘরে শান্তি বিরাজ করিবে। সন্তানসন্ততিগণ জন্মিয়া বর্ত্তমান কালের ন্যায় দুঃখ ও মনস্তাপের কারণ না হইয়া সুখের ও আনন্দের কারণ হইবে, এবং তাহাদের দ্বারা দেশের ও মঙ্গল সাধিত হইবে। সে পথ অতি সহজ পথ। বর্ত্তমান কালের সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায়ই পিতা মাতার দুঃখ ও মনস্তাপের কারণ হয়, এবং দেশের ও সমাজের অশান্তির ও অবনতির কারণ হয়। তাহাদের দ্বারা না দেশের, না পিতা মাতার উপকার হয়। তাহারা কেবল জগতের ক্ষয়ের জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রে সকল পথই বর্ণিত আছে, কিন্তু সকলের শাস্ত্র পাঠ করিবার সময় হয় না। আর শাস্ত্রও অনন্ত, সমুদ্র বিশেষ, তাহার মধ্যে হইতে অনুসন্ধান করিয়া রত্ন বাহির করাও সহজ নয়। আবার বুঝিবার লোকও বিরল। উত্তর গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
সল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসার ভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥

অর্থাৎ শাস্ত্র অনন্ত, জানিবার বিষয়ও অনেক, সময় অল্প, বিঘ্নও অনেক, সুতরাং তাহার মধ্যে যাহা সার তাহাই জ্ঞাত হইয়া কার্য্য করা উচিত। হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয় অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুগ্ধরূপ সারাংশ গ্রহণ করে সেইরূপ।

সন্তান সন্ততি উৎপন্ন করিবার আমরা যে আর একটী উপায়ের কথা বলিলাম, তাহা সহজ সাধ্য এবং সকলের করণীয়। ইহাতে কোন কষ্ট নাই, পরিশ্রম নাই; কেবল মাত্র একটু স্থৈর্য্যতা, ধৈর্য্যতা এবং বিবেচনার আবশ্যক। তাহা করিতে পারিলেই আশাতীত ফললাভ করিতে পারা যায়। পর পরিচ্ছেদে আমরা সেই বিষয় আরম্ভ করিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, ইহাই শাস্ত্রের বচন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে তাহা না বলিয়া, কাম চরিতার্থতার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা বলিলেই ঠিক বলা হয়। কারণ, বর্ত্তমান কালে বিবাহের সময় বর ও কন্যা উভয়েই বিবাহের যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে তাহা শিক্ষা না পাইয়াই বিবাহ করিয়া থাকে, তাহার ফলে অসংযত চিত্ত কাম কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া কাম চরিতার্থ করিবার জন্যই ব্যস্ত হয়, এবং স্ত্রী কাম চরিতার্থ করিবার একটী আধার মনে করিয়া প্রায়ই স্ত্রীকে কাম চক্ষে দেখিয়া থাকে। আমরা কথায় বলিয়া থাকি স্ত্রীভাগ্যে লক্ষ্মী। এই কথাটী সম্পূর্ণ সত্য। স্ত্রী লক্ষ্মীরূপা, স্ত্রীই গৃহের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। স্ত্রীহীন গৃহ শ্মশান তুল্য। স্ত্রী সংসার আশ্রমে, সুখের ও আনন্দের উৎস। স্ত্রী ব্যতীত সংসার আশ্রম হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই স্ত্রীজাতিকে কোন কোন সাধুবেশধারী পণ্ডিত নিন্দা করিয়া থাকেন, যেমন বর্ত্তমান কালের রচিত অবধূত গীতার ৮ম অঃ ১২ শ্লোকে লেখা আছে দেখিতে পাই যথা:—

ন জানামি কথং তেন নির্ম্মিতা মৃগলোচনা।
বিশ্বাসঘাতকীং বিদ্ধি স্বর্গ মোক্ষ সুখার্গলম্॥

অর্থাৎ মৃগলোচনা ভগবান কেন যে নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা জানি না। তাহারা স্বর্গ ও মোক্ষের অর্গলস্বরূপ। এইরূপ উক্তিতে গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণ রূপে কুরুচি সম্পন্ন করা হইয়াছে, এবং দত্তাত্রেয়কে জীবন্মুক্ত পদ হইতে সাধারণ পণ্ডিত শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। দত্তাত্রেয় মুক্ত পুরুষ ছিলেন, তাঁহা দ্বারা কদাচ এরূপ অজ্ঞানের কথা বর্ণিত হইতে পারে না। ইহা যে কোন অপরিনামদর্শী পণ্ডিতের দ্বারা রচিত হইয়াছে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। রচয়িতা, একজন পণ্ডিত হইয়াও উক্ত শ্লোকটী রচনা করিবার পূর্ব্বে একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই, যে স্ত্রীজাতি বিনা সৃষ্টি কেমন করিয়া রক্ষা হইবে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

পৃথিবীতে প্রজা সৃষ্টির সময় মৃগলোচনা, অর্থাৎ নারী যে কত প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা প্রজাপতি ব্রহ্মাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কি প্রকারে প্রথমে প্রজা সৃষ্টি করা হইয়াছিল, তাহার বিষয় আমরা কিছু বলিব, তাহা হইলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। বর্ত্তমানকালে শিক্ষিত যুবকগণ, সিজারের, ওয়াসিংটনের, নেপোলিয়ানের ও আকবরের পূর্ব্বপুরুষগণের জন্মবৃত্তান্ত অনায়াসেই বলিতে পারিবেন, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জন্মবৃত্তান্ত অনেকেই বলিতে পারিবেন না। তাঁহাদের অবগতির জন্য আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের উৎপত্তির বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। সৃষ্টির আদিতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। প্রথমে ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির উদ্ভব হয়। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা ; অর্থাৎ সত্ব রজঃ ও তমঃ গুণবিশিষ্টা। সত্বগুণে বিষ্ণু, রজঃগুণে ব্রহ্মা, আর তমঃগুণে মহেশ্বরের উৎপত্তি হইল। এই তিন শক্তির মধ্যে শ্রীভগবান মহেশ্বরকে উপযুক্ত স্থির করিয়া তাঁহাকে প্রজা উৎপন্ন করিবার ভার দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। মহেশ্বর সৃষ্টির ভার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ইচ্ছামত, ভুত, প্রেত, দৈত্য, দানা প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভগবান দেখিলেন এইরূপ জীবের দ্বারা জগতের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবার আশা নাই, সেইজন্য তিনি পুনর্ব্বার আবির্ভাব হইয়া বলিলেন, মহেশ্বর! এখন হইতে আর তোমার প্রজা উৎপন্ন করিবার আবশুক নাই। এখন হইতে ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যে রত থাকিবেন, বিষ্ণু পালন কার্য্যে, আর আপনি সংহার কার্য্যে রত থাকিবেন।

এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্ধান হইলেন। ব্রহ্মা ভগবানের আদেশ পাইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে চারিজন মানস কুমার সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ এই চারিজন কুমার তাঁহার সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হইল; এইজন্য তাঁহাদের অযোনি সম্ভবা বলা হয়। তাঁহাদের নাম, সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনাতন। তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া কেহই সংসারী না হইয়া ঊর্দ্ধরেতাঃ হইয়া তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। ঊর্দ্ধরেতাঃ শব্দের তাৎপর্য্য অনেকেরই বোধ নাই, সেই জন্য তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বলা আবশ্যক। ঊর্দ্ধ শব্দের অর্থ উচ্চ, আর রেতঃ শব্দের অর্থ শুক্র, এই শুক্রধাতুই জীবের প্রাণ। যিনি আপন প্রাণকে ঊর্দ্ধে স্থিতি করিতে সমর্থ হন, তিনিই ঊর্দ্ধরেতাঃ পদবাচ্য হন। এ কার্য্য অতি কঠিন কার্য্য, যোগী ঋষিরাই তাহা করিতে পারেন, সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা অসম্ভব। তৎপরে ব্রহ্মা যখন দেখিলেন যে কেহই সংসারী হইল না, তখন তিনি পুনরায় দশজন মানস কুমার সৃষ্টি করিলেন। তাঁহাদের নাম মরিচী, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, নারদ, বশিষ্ট, ও ভৃগু। এই দশ জনকে তিনি প্রজা উৎপন্ন করিবার ভার দিলেন। কিন্তু তিনি যোগ দৃষ্টিতে দেখিলেন যে প্রকৃতি বিনা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য তিনি নিজ তনুকে দুই অংশে বিভক্ত করিলেন। বাম অংশ হইতে শতরূপা কন্যা, আর দক্ষিণ অংশ হইতে সায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হইল। ইঁহাদের হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। ইঁহারা দুই জনে সংসারী হইতে সম্মত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতে ব্রহ্মার মানস কুমার উৎপন্ন করিবার প্রথা স্থগিত হইয়া, স্থূল মৈথুন ক্রিয়া দ্বারা প্রজা উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল। শতরূপা কন্যা ও স্বায়ম্ভুব মনুর সংযোগে দুই পুত্র, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ; আর তিন কন্যা, আকুতি, প্রসূতি আর দেবহুতি জন্মগ্রহণ করিল। স্বায়ম্ভুব মনু আকুতিকে রুচিমুনিকে দান করিলেন, প্রসূতিকে দক্ষকে, আর দেবহুতিকে কর্দ্দম মুনিকে দান করিলেন। দক্ষের বহু পুত্র জন্মিল। দক্ষ পুত্রগণকে সৃষ্টি বৃদ্ধি করিবার ভার দিলেন। নারদ এই সম্বাদ জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, যে প্রজা বৃদ্ধি করিবার পূর্ব্বে তোমরা পৃথিবীর পরিমাণ কত তাহা জানিয়া আইস, স্থানের কুলান হইবে কি না দেখিয়া তার পর প্রজা বৃদ্ধি করিও। এই কথা শুনিয়া সকলে পৃথিবীর পরিমাণ কত জানিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। অবশেষে তাঁহারা পৃথিবীর অন্ত না পাইয়া মনে বৈরাগ্য উদয় হওয়ায় আর গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া

নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। ইহার পর দক্ষের যত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল তাঁহারা ভ্রাতাদিগের অন্বেষণ করিতে গিয়া ভ্রাতাদিগেরই গতি প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ কেহই আর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না। এই কারণে আমাদের সমাজে ভ্রাতা হইয়া ভ্রাতার উদ্দেশে বিদেশে যাইবার প্রথা নাই। দক্ষ যখন দেখিলেন যে কোন পুত্রই সংসারী হইল না, তখন তিনি যাট কন্যা উৎপন্ন করিলেন। এই সকল কন্যা তিনি কাহাকে কাহাকে দান করিলেন, সে সকল বিষয় মহাভারতে লেখা আছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। আমাদের যাহা আবশ্যক তাহা জানা হইয়াছে, অর্থাৎ আমাদের আদি পুরুষ, কে, এবং আমরা কাহা কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়াছি। আমরা দেখিলাম যে স্বায়ম্ভুব মনুই আমাদের আদি পুরুষ, এবং আমরা সকলেই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি।

এইরূপে ক্রমেই প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন সমাজের বন্ধন স্বরূপ কিছুই ছিল না। শ্রীভগবান দেখিলেন যে সমাজের যদি কোনরূপ বন্ধন সৃষ্টি না করা হয়, তাহা হইলে বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে ও বর্ণসঙ্কর দোষ হইতে পারে, এই জন্য তিনি লোকের গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে চারিটী বর্ণের সৃষ্টি করিলেন, যথা :—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ,—যিনি ব্রহ্মকে জানেন ; সাধনা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হয়। ব্রাহ্মণ, গুণগত, বংশগত নয়, তাহা নিম্ন লিখিত শ্লোকে বুঝা যায়। ক্ষত্রিয়,—যিনি ব্রহ্মকে জানিবার জন্য ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করেন। বৈশ্য,—যিনি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করেন। শূদ্র যিনি জ্ঞান লাভের জন্য সাধু পরিচর্য্যা করেন। এই চারি বর্ণের বিভাগ অনুসারেই আমাদের সমাজের কার্য্য অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥

গীতা ৪র্থ অঃ ১৩ শ্লঃ।

অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি (সত্য কিন্তু) তাহার কর্ত্তা হইলেও বস্তুতঃ আমায় অব্যয় এবং (আসক্তি শূন্যতা বশতঃ) অকর্ত্তা জানিও। কর্ত্তা বলিয়া আবার অকর্ত্তা বলিবার গূঢ় ভাব এই যে, তাঁহার কাছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের কোন প্রভেদ নাই। তাঁহার কাছে

সকলেই সমান। তবে যে তিনি চাতুর্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কেবল সমাজের শৃঙ্খলতা ও মঙ্গলের জন্য। তাঁহার কাছে ভেদাভেদের কোন সম্বন্ধই নাই, এইজন্য তিনি অকর্ত্তা। তাঁহার কাছে ভেদাভেদ থাকিলে তাঁহাতে পক্ষপাতিতা দোষ আসিয়া পড়ে। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা দেখিলাম নারী জাতির সৃষ্টি কি জন্য হইয়াছিল। এবং নারী জাতির সৃষ্টির কত আবশ্যক।

অবধূত গীতায় আমরা নারীজাতির নিন্দা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু ভগবান জানিত কবি শ্রীমৎ জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দে নারীর সম্মান কত বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা তাঁহার একটী কবিতা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। জয়দেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার পায়ে ধরাইয়া ছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধাকে শক্তিতে বড় দেখিতেন। কবিতার মাধুর্য্য এবং প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য, এবং কি ঘটনা উপ-লক্ষে জয়দেব এই কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, পাঠকের কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য, সেই কবিতার মধ্যে মধ্যে মধুর ভাবগুলি উদ্ধৃত করিয়া [illegible] দিলাম। ঘটনাটী এই, নিশাকালে নিরূপিত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুঞ্জে না আসাতে বৃষভানুনন্দিনীর অত্যন্ত অভিমান হইল, তিনি মনের [illegible] বিলাপে নিশা অতিবাহিত করিলেন। তৎপরদিন প্রাতে শ্রীকৃষ্ণ আসিলে পর তাঁহাকে প্রণয়চ্ছলে যৎপরনাস্তি তিরস্কার করিলেন, [illegible] শ্রীকৃষ্ণের অনাদরের এবং প্রত্যাখ্যানের শোক অপনয়ন হইল না, তিনি সমস্ত দিবস বিলাপে অতিবাহিত করিলেন। পরে সায়ংকালে হৃদয়ের কোন কথঞ্চিৎ অপনয়ন হইলে তিনি সহচরী সঙ্গে লইয়া হত আশার দগ্ধ হৃদয়কে শীতল করিবার মানসে নিকুঞ্জ বনে শীতল বায়ু সেবনের জন্য গমন করিলেন। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে বৃন্দাদূতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; সখী! শ্যামকে তিরস্কার করে আমার মন, প্রাণ যে আরও খারাপ হয়ে গেল! হায়! কেন আমি তাঁকে তিরস্কার করিলাম! বোধ হয় শ্যাম আর আমার কাছে আসবেন না!

বৃন্দা উত্তর করিলেন, সখী! তুমি অত ভেবো না, শ্যাম আস্‌বেন না তো কোথায় যাবেন? তুমি ছাড়া তাঁর আর গতি নাই!

রা। না সখী! তাঁর যে হাজার গোপিনী আছে!

বৃ। সত্য, কিন্তু তুমি [illegible] প্রধানা!

এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ নটবর বেশে মোহন মুরলী বাজাইতে বাজাইতে কুঞ্জ বনে প্রবেশ করিলেন। অমনি বৃন্দা বলিলেন ওই গো! শুন, নটবর আসচেন! দেখ, তুমি এক কাজ কর, ঐ কুঞ্জকুটীর মধ্যে এক হাত ঘোমটা দিয়ে মান করে বসে থাক, আজ তোমার পায়ে ধরাব, তবে ছাড়্‌বো!

বংশীধ্বনি করিতে করিতে শ্যাম নটবর ক্রমে কুঞ্জকুটীরের নিকটে আসিতে লাগিলেন। শ্যামের বাঁশীর একটী আশ্চর্য্য গুণ আছে, এ সাধারণ বাঁশের বাঁশী নয়, ইহার নাম মোহন বাঁশী; এ বিশ্ববিমোহনকারী বাঁশী! আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী ইহার স্বর! আর সেই স্বর এক রকমের স্বর নয়। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। এই সপ্ত স্বর এক সঙ্গে মিলিত হইয়া ধ্বনি হয়! যে কেহ ইহা শ্রবণ করে সেই মোহিত হয়। আর যাঁর মনের ভাব যেরূপ, তিনি সেই ভাবেই শুনিয়া থাকেন! তাই বৃষভানু নন্দিনী বংশীর ধ্বনি শুনিয়াই মনে মনে ভাবিলেন, এই যে কেলে সোণা তো এখনো আমাকে ভাল বাসে! ওই যে বাঁশী আমাকে রাধে! রাধে! রাধে! রাধে! বলে ডাকচে! মা যশোদা বাঁশীর স্বর শুনে মনে ভাবছেন আমার নীলকান্তমণির খিদে পেয়েছে, তাই ননী খাবার জন্য বাঁশী বাজাতে বাজাতে আমার কাছে আসচে! শ্রীদাম সুদাম মনে কচ্চে যে প্রাণ কানাই বুঝি খেলা কর্‌বার জন্য আমাদের ডাকচে! গাভী সকল বাঁশীর স্বর শুনে কান খাড়া করে হাম্বা হাম্বা করিয়া ডাকিতে ডাকিতে, ভাবচে যে আমাদের বুঝি গোষ্ঠের যাবার সময় হয়েছে। আবার যোগী ঋষিরা বাঁশীর স্বর শুনে মনে মনে ভাবচেন যে বাঁশীতে ওঁকার ঝঙ্কার হচ্চে। এইরূপ যাঁহার মনের যেরূপ ভাব, তিনি সেই ভাবে বাঁশীর স্বর শুনিতেছেন। এই কালার বাঁশী দ্বাপর যুগে নিকুঞ্জ বনে, ভাণ্ডির বনে, যমুনা পুলিনে বেজেছিল, আর কলি-যুগেও দিনরাত বাজ্‌ছে, আর চিরকালই বাজ্‌বে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন শুনিবার লোক নাই। আমরা এখন পয়সা দিয়ে নাট্য মন্দিরে বাঁশী শুনিবার জন্য ছুটে যাই। যে বাঁশী শুন্‌তে কোন ব্যয় নাই, আর যাহা শুনিলে মন প্রাণ শীতল হয়, তাহা শুনিবার জন্য আমরা কোন চেষ্টাই করি না, সুতরাং আমাদের উন্নতির আশা কোথায়? যাহা হউক সে দুঃখের কথা এখন আর কাজ নাই।

ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জকুটীরের নিকটে আসিয়া দেখিলেন বৃন্দাদূতী দ্বারের

নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, প্রিয় সখী! আমার শ্রীরাধা কোথায়?

সু। ঐ কুটীর মধ্যে দেখ, তিনি মান করিয়া বসিয়া আছেন!

কৃ। কেন? এত মান কেন?

সু। তা ভাই তোমরাই জান, আমি তোমাদের প্রেমের জোয়ার ভাঁটা কিছু বুঝ্তে পারি না, তোমরা দুজনে বোঝাপড়া কর।

এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীরাধা আরও এক হাত ঘোমটা টানিয়া মাটির সঙ্গে সমান করিয়া দিয়া বসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন এ দুর্জয় মান! এ মান সহজে যাবে না। তাই তিনি মানভঞ্জন করিবার জন্য জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া জোড় হস্তে হাস্য বদনে বলিতে আরম্ভ করিলেনঃ—

* * *

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মান মনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্।
দেহি মুখ কমল মধু পানম্।

অর্থাৎ প্রিয়ে! চারুশীলে! অকারণে আমার প্রতি অভিমান করিতেছ কেন? এ অভিমান ত্যাগ কর। তোমার মুখ শোভা দেখিবামাত্র কামাগ্নি মদীয় হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। আমাকে তদীয় বদন পদ্মের মধু পান করিতে দাও।

* * *

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্,
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সতত মনুরোধিনী,
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্।

অর্থাৎ তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই এই ভবসাগরে আমার রত্নস্বরূপ। আমার অন্তরের ইচ্ছা এই যে, তুমি নিয়ত মৎপ্রতি অনুরাগিনী থাক।

* * *

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্,
দেহি পদপল্লব মুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো,
হরতু তদুপাহিত বিকারম্॥

অর্থাৎ কামবিষের খণ্ডনকারী মদীয় অভীষ্ট তোমার মনোহর পদপল্লব আমার শিরোপরি বিন্যস্ত কর, মদীয় মস্তকের ভূষণস্বরূপ হউক। দেখ, দুরন্ত কামাগ্নি আমার সমস্ত দেহকে দগ্ধ করিতেছে, তোমার প্রসাদে সে বিকার বিনষ্ট হউক।

এইখানে মাধুর্য্যের, ভাবের ও ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। এত মধুরতা আর কোন কবিতায় পাওয়া যায় না। ইহা কেবল গীত গোবিন্দতেই পাওয়া যায়। রসগোল্লা যেমন চিনির রসে ডুবে থাকে, এই কবিতার শব্দগুলি সেইরূপ প্রণয়ের পীযূষ রসে যেন ডুবে রয়েছে। "তোমার মনোহর পদপল্লব আমার শিরোপরি স্থাপন কর, তাহা আমার মস্তকের ভূষণ স্বরূপ হউক," এই কথা শুনিলে কোন্ প্রণয়িনীর প্রাণে তাহার প্রাণেশের উপর আর অভিমান থাকিতে পারে? বোধ হয় কাহারও নয়। রাধারও তাহা থাকিল না। এই কথা শুনিবামাত্র শ্রীরাধা তাঁহার সুললিত মৃণাল ভুজযুগলে প্রেমভরে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও যেন হাতে স্বর্গ পাইয়া, দুই হাতে রাধাকে বেষ্টন করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন! কাঞ্চনে যেন কৌস্তভ সংযুক্ত হইল! পুরুষ প্রকৃতি একত্রে মিলিত হইল! বৃন্দাদূতী মুচকি মুচকি হাসিয়া বলিল, "ওহে শ্যাম নটবর! এতক্ষণ প্রেমতরঙ্গিনীতে ভাঁটা পড়েছিল, এইবার জোয়ার এসেছে, তুমি হাল ফেলে দিয়ে পাল তুলে দাও, দিয়ে প্রেম তরঙ্গিনীর তরঙ্গে ভেসে চলে যাও!"

শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সখী! তুমিও আমাদের পিছু পিছু এস!

বৃ। না ভাই! আমার কাণ্ডারী নাই, তুফানে সাম্‌লাতে পারবো না, তরি ডুবে যাবে!

কৃ। সে জন্যে তুমি ভেবো না, পথে অনেক বিনা কড়ির কাণ্ডারী পাবে, সেই তোমাকে প্রেম তরঙ্গিনীর তরঙ্গে বিনা কড়িতে পার করে দেবে।

বৃ। কেন? আমার বিনা কড়ির কাণ্ডারীর আবশ্যক কি? তুমি তো ভবের কাণ্ডারী, আমাকে আর পার কর্‌তে পারবে না?

কৃ। বৃন্দে! তুমি আমার প্রেম তরঙ্গিনীর প্রিয় সখী, তুমি সে কথা বল্‌বার পূর্ব্বেই আমি তোমাকে পার কোরে রেখেছি।

বৃ। তবে এতদিন পরে বুঝ্‌লেম যে আমার সাধনা সফল হয়েছে!

এক্ষণে যে ঘটনা লইয়া জয়দেব এই কবিতাটী লিখিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বলা শেষ হইল। আমরা জয়দেবকে ভগবান জানিত কবি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহার কারণ কি এইবার তাহা বলিব। জয়দেব সম্বন্ধে যে একটী জনশ্রুতি আছে তাহা এই। জয়দেব এই কবিতা লিখিতে লিখিতে "স্মর গরল খণ্ডন, মম শিরসি মণ্ডন" পর্য্যন্ত লিখিয়া, তাহার পরের চরণটী ভাবপূর্ণ সুললিত ভাষায় লিখিতে অক্ষম হওয়ায়, অত্যন্ত চিন্তিত ও নৈরাশ হইয়া গোবিন্দ! গোবিন্দ! বলিয়া গোবিন্দকে স্মরণ করিয়াছিলেন। পরে মনে মনে ভাবিলেন যে এখন তাঁহার চিত্ত স্থির নাই, স্নান আহার সমাপ্ত করিয়া নিদ্রার পর চিত্ত স্থির হইলে তিনি পুনরায় লিখিতে চেষ্টা করিবেন। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া কবিতাটী যথাস্থানে রাখিয়া তিনি স্নান আহারের জন্য উঠিয়া গেলেন, পরে স্নান আহার সমাপ্ত করিয়া নিদ্রা গেলেন। নিদ্রায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে "জয়দেব! তুমি চিন্তিত হইও না আমি তোমার কবিতার অপূর্ণ চরণটী লিখিয়া দিয়াছি।" এই কথা শুনিবামাত্র তিনি নিদ্রা হইতে তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া কবিতাটী লইয়া পাঠ করিতে বসিলেন। পাঠ করিয়া দেখিলেন অপর এক হস্তাক্ষরে অপূর্ণ চরণটীর স্থানে লেখা রহিয়াছে "দেহি পদপল্লব মুদারম্।" জয়দেব এইটী পাঠ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে ভাবিলেন যে তাঁহার বাটীতে তো এমন কোন লোক নাই যে এরূপ ভাষা লিখিতে পারে; তবে কে ইহা লিখিল? তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, যে তিনি যে গোবিন্দকে স্মরণ করিয়াছিলেন, তিনিই লিখিয়াছেন, এরূপ লেখা আর কাহারও সাধ্য নয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর ভক্তিতে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার উপর গোবিন্দের যথেষ্ট কৃপা আছে! তিনি ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া কবিতাটী হস্তে লইয়া মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বার বার গোবিন্দকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। এই কবিতার এই একটী চরণেতেই জয়দেব ভারতে অদ্যাবধি চিরস্মরণীয় হইয়া

আছেন। এইজন্য আমরা জয়দেবকে ভগবান জানিত কবি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি।

আমরা জয়দেব সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়া তাঁহার কথা শেষ করিব। জয়দেব একজন উন্নত অবস্থাপন্ন সাধক এবং ভগবানের পরম ভক্ত ও সাধু ছিলেন। ভগবানের ভক্ত না হইলে কি গীত গোবিন্দের ন্যায় ভাষা অপরে লিখিতে পারে? অদ্যাবধি এরূপ ভাষা আর কেহ লিখিতে পারে নাই; আর কেহ কখন যে পারিবে তাহাও অনুমান হয় না। জয়দেব তাঁহার চর্ম্ম চক্ষেই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সম্মুখে সর্ব্বদা বর্ত্তমান দেখিতেন; এবং তাহারই আভাষ তিনি তাঁহার একটী কবিতার এক ছত্রে দিয়াছেন, তাহা পরে বলিতেছি।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন:—

> বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যন্তে।
> বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥
>
> গীতা ৭ম অঃ ১৯ শঃ।

অর্থাৎ বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ "এই চরাচর বিশ্বই বাসুদেব" এই জ্ঞানে আমাকে প্রাপ্ত হন; তেমন মহাত্মা সুদুর্লভ।

জয়দেব সেই সুদুর্লভ মহাত্মাগণের মধ্যে একজন, এবং তিনি "এই চরাচর বিশ্বই বাসুদেব" এই জ্ঞানে বাসুদেবকে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার বহির্জগতের রূপ, জয়দেব তাঁহার একটী কবিতাতে যাঁহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই:—

> চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর পীত বসন বনমালী।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নীল কলেবরে চন্দনে অনুলিপ্ত হইয়া পীত বসনে শোভিত হইয়াছেন।

ইহার গূঢ় ভাব এই। আমরা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই যেন একখানি সুবৃহৎ সুনীল চন্দ্রাতপ আকাশময় ব্যাপ্ত হইয়া আছে; এই দৃশ্য মেঘ শূন্য আকাশে এবং শরৎকালেই ভালরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে দেখা যায় না। এই নীলবর্ণ কেবল যে আকাশের উর্দ্ধ দিকেই আছে, তাহা নয়। ইহা পৃথিবীর উর্দ্ধে, অধঃভাগে এবং পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে, ইহার আদি অন্ত নাই; ইহা অনাদি, অসীম।

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁহারও আদি অন্ত নাই; সেই জন্য জয়দেব এই

নীল বর্ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বব্যাপী নীল বর্ণ কলেবর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আর শ্বেত, লোহিত বর্ণ মেঘগুলিকে চন্দনস্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর সূর্য্যের কিরণকে পীত বসন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সূর্য্যের কিরণ জড় পদার্থের উপর পড়িলেই দেখা যায়, শূন্যে উহা দেখা যায় না। সেইজন্য শূন্যস্বরূপ নীল কলেবরে আমরা পীত বসন জড়িত দেখিতে পাই না। এই নীল বর্ণ আমরা শূন্যে চাহিলে নিকটে দেখিতে পাই না। আমরা যতই উর্দ্ধে উঠিয়া দেখি না কেন, ইহা ততই আমাদের দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। নিকটে উহা চর্ম্মচক্ষের অগোচর। যেমন মহাসমুদ্রের জল দূর হইতে গাঢ় নীল বর্ণ দেখায়, কিন্তু ঐ জল কোন পাত্র দ্বারা উঠাইয়া নিকটে আনিয়া দেখিলে আর নীল বর্ণ দেখা যায় না, সেইরূপ। মহাসমুদ্রের নীলবর্ণ জলে নানা আকারের বুদ্বুদ উত্থিত হইতেছে, আবার সেই জলেই বিলীন হইতেছে, কিন্তু যেখানকার জল সেইখানেই থাকে, কোথায়ও যায় না। সেইরূপ এই সুনীল মহাশূন্যস্বরূপ মহাসমুদ্রে আমরা উৎপন্ন হইতেছি আবার তাহাতেই লয় হইতেছি, কিন্তু যেমন ঘটের নাশে ঘটাকাশের নাশ হয় না, তদ্রূপ আমাদের নশ্বর দেহের নাশ হইলেও, আমাদের দেহ মধ্যস্থ আত্মার নাশ না হইয়া সুনীল শূন্য স্বরূপ পরমাত্মায় মিশিয়া যায়। অর্থাৎ দেহের নাশে দেহীর নাশ হয় না। বস্তুতঃ জ্ঞানের চক্ষে মৃত্যু নাই। শ্রীভগবানও তাহাই বলিয়াছেন যথা :—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

গীতা ২য় অঃ ১৩ শঃ।

অর্থাৎ দেহাভিমানী জীবের যেমন এই দেহে, কৌমার, যৌবন ও জরা, দেহান্তর প্রাপ্তি, অর্থাৎ মৃত্যুও সেইরূপ (অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র) অতএব জ্ঞানী তাহাতে মোহিত হয় না।

তবে যে আমরা মৃত্যু দেখি তাহা আমাদের বিকার, এবং সেই বিকার বশতঃই প্রকৃত তথ্য উপলব্ধি করিতে পারি না।

এই চরাচর বিশ্বব্যাপী সুনীল গোলককে ব্রহ্মের অণ্ড বলা যায়। ইহাই আত্মার বহির্জগতের মূর্ত্তি। তাই আমরা চরাচর বিশ্বকে ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া থাকি।

এই মূর্ত্তিকেই, ইহার বিশ্বব্যাপীত্ব হেতু, জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের নীল কলেবর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর এই মূর্ত্তিই যে আত্মার বহির্জগতের মূর্ত্তি তাহা ভগবান উক্ত, নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥
অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥

গীতা ২য় অঃ ২৩।২৪ শ্লোক।

অর্থাৎ শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না, এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ২৩

ইনি অচ্ছেদ্য, ইনি অদাহ্য, ইনি অক্লেদ্য এবং অশোষ্য ; ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী স্থির ভাব, সদা একরূপ। ২৪

এই চরাচর বিশ্বব্যাপী আত্মার মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে সদা বর্ত্তমান থাকিতেও, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। কেবল উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে আমরা নীল বর্ণের একখানি চন্দ্রাতপের ন্যায় দেখিয়া থাকি। বস্তুতঃ তাহা নয়। ইনিই নীল বর্ণ শূন্যস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী আত্মা। কেহ ইহাকে শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না, ইনি সর্ব্বব্যাপী সদা একরূপ এবং স্থির ভাব। কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা তাহা প্রণিধান করিতে পারি না। স্থিরত্বই শক্তি এবং অবিনাশী, এবং চঞ্চলতাই সৃষ্টি এবং বিনাশী। আমরা নিজ নিজ কার্য্যতেই দেখিতে পাই যে, যে কার্য্য আমরা স্থিরচিত্তে ও স্থিরভাবে করি তাহা প্রায়ই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, আর যাহা অস্থিরভাবে এবং অস্থিরচিত্তে করি তাহা বিশৃঙ্খল ও সদোষ হইয়া থাকে।

বহু জন্মের তপস্যার ফলে যে মহাত্মা পরমাত্মার মূর্ত্তি দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন না ; কারণ যিনি অব্যক্ত তাঁহাকে ব্যক্ত করিবার শক্তি জীবের নাই। যেমন একজন মূককে নানাবিধ

অন্নব্যঞ্জনাদি পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেও, সে যেমন তাহার ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারে না, ইহাও তদ্রূপ। জয়দেব একজন উন্নত অবস্থাপন্ন সাধক ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই আত্মার মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার উপরোক্ত কবিতাটীতে তাহা প্রকাশ করেন নাই; আর তাহা প্রকাশ করিবারও ঐ স্থানে কোন প্রয়োজন হয় নাই। তিনি কেবল মাত্র আত্মার মূর্ত্তির আভাষ মাত্র দিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যিনি অব্যক্ত তাঁহাকে ব্যক্ত করিবার শক্তি জীবের নাই। তবে কেবল এই মাত্র বলা যায় যে, যোগী যখন আপনার প্রাণকে যোগবলে সুষুন্না মার্গে লইয়া গিয়া, ষট্‌পদ্ম ভেদ করিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সেই স্থানে চরাচর বিশ্বব্যাপী সহস্র পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতির ন্যায়, জ্যোতির মধ্যে এই বহির্জগতের বিশ্বব্যাপী নীল গোলক ও তাহার মধ্যস্থলে জ্যোতিঃস্বরূপ বিন্দুরূপী নারায়ণ দেখিতে পান। এই স্থানেই প্রকৃতি পুরুষের মিথুন ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানেই নাদ ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। অবিরত অনাহত বিশ্ব ব্যাপী মধুর ধ্বনী হইতেছে। সে ধ্বনি যে কি মধুর তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যোগী সেই জ্যোতিঃ দেখিতে দেখিতে আর সেই অনাহত মধুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভাবে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইয়া যান, তথা হইতে আর নামিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সাধনা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত না হইলে, চঞ্চলতাবশতঃ সে অবস্থা স্থায়ী হয় না, সে দৃশ্য অদৃশ্য হইয়া যায়; সুতরাং যোগীকে পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। এই স্থানেই সুরপতি ইন্দ্রের ঐরাবত নামক গজেন্দ্র ও উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরাজের দর্শন লাভ হয়। কিন্তু তাহা বহু সাধন সাপেক্ষ। অহো! সে যে কি দৃশ্য তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। দ্রষ্টার তন্ময়তা হেতু মনপ্রাণ সকলই তথায় লয় হইয়া যায়। যাহা হউক সে সকল বিষয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, কেবল জয়দেবের কবিতার একটী ছত্রে কত গূঢ় ভাব আছে, তাহাই পাঠকের অবগতির জন্য এই বিষয় লিখিতে হইল।

জয়দেব নারীকে এত সম্মান প্রদান করিলেও সকলকার তাহা অনুমোদনীয় না হইতে পারে, কারণ জয়দেব ভগবান জানিত লোক হইলেও অস্থি মাংস বিশিষ্ট দেহধারী মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব নারীকে সম্মানের কত উচ্চ আসন দিয়াছেন তাহা অমান্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তাহা এই ঃ—

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ত্বমাদ্যা পরমাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিনী।
তব শক্ত্যা বয়ং শক্তাঃ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদিষু॥ ১
তব রূপাণ্যনন্তানি নানা বর্ণাকৃতীনি চ।
নানা প্রয়াস সাধ্যানি বর্ণিতুং কেন শক্যতে॥ ২

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্। পঞ্চমোল্লাসঃ।

অর্থাৎ তুমি আদ্যা ও পরমাশক্তি। তুমি সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। তোমার শক্তি প্রভাবে আমরা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি নানা কার্য্যে সমর্থ হইয়াছি। তোমার নানা বর্ণ, নানা আকার বিশিষ্টব এবং বহু প্রয়াসে সাধনার অনন্তরূপ আছে। কোন্ ব্যক্তি সে সমুদয় রূপ বর্ণন করিতে পারে?

এই তো শিববাক্য, ইহাতে কাহারও অশ্রদ্ধা হওয়া উচিত নয়। তবে কেহ কেহ এই কথা বলিতে পারেন, যে সদাশিব ঐ সকল কথা আদ্যাশক্তি প্রকৃতিকেই বলিয়াছেন, সাধারণ নারীকে বলেন নাই। এ কথা সত্য। কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে ইহার সূক্ষ্ম ভাবটুকু বুঝিলেই মনে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। সূক্ষ্ম ভাব এই, প্রকৃতি এক বই দুই নয়। কিন্তু প্রকৃতির রূপ নাই, তিনি অব্যক্তরূপে চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। নারী মূর্ত্তিই তাঁহার ব্যক্ত মূর্ত্তি। তিনি নানা নারী মূর্ত্তিতে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং হইতেছেন। যেমন মহাসমুদ্রে নানা আকৃতির জলবুদ্বুদ উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতেই লয় হইতেছে, আবার ভিন্ন আকারে উৎপন্ন হইতেছে, ইহাও সেই প্রকার। সুতরাং একজন নারীকে নিন্দা করা বা নির্যাতন করা বাস্তব পক্ষে সেই আদ্যাশক্তি প্রকৃতিরই নিন্দা বা নির্যাতন করা হয়। সকল সম্প্রদায়েই ভাল মন্দ দুইই আছে, দুই চারিটা অথবা দশ বিশ্টা কুচরিত্রা নারীর চরিত্র দেখিয়া, সমগ্র নারীজাতির নিন্দা করা নিতান্ত অর্ব্বাচিনের কার্য্য। নারী নিন্দা বা নির্যাতন মহা পাপ। সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিন্তু নারী নিন্দা বা নির্যাতনের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত সেই বিক্ষুব্ধ নারীর পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করা; ইহা ব্যতীত আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। সেইজন্য জয়দেব সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার পায়ে ধরাইয়া দেখাইয়াছিলেন। জগতে প্রকৃতিরই প্রাধান্য।

প্রকৃতি সম্মুখে, পুরুষ পিছনে। এই জন্য হিন্দু সমাজে পুরুষ প্রকৃতি বিবাহ বন্ধনে মিলিত হইবার সময়, স্ত্রীআচার কালীন কন্যাকে সম্মুখে আর বরকে পিছনে রাখা হয়। এই প্রথা মুনি ঋষিগণ সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ প্রকৃতি সম্মুখে পুরুষ পিছনে। এবং তাহাই আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। অনেকে এই প্রথার প্রকৃত অর্থ জানেন না বলিয়া তাহার প্রকৃত অর্থ বর্ণনা করা হইল। বর্ত্তমান কালের অবধুত গীতার রচয়িতা পণ্ডিত এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটুকু বুঝেন নাই, তাই নারীর চরিত্র ঐরূপ কদর্য্য ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক কৃষ্ণলীলার পালা বর্ণনা করা আমাদের শেষ হইল, এইবার আমাদের পালা আরম্ভ করিব।

স্ত্রীরূপা ক্ষেত্র হইতে আমরা সন্তান সন্ততি রূপ ফললাভ করিয়া থাকি। কিন্তু কি উপায়ে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়, তাহা আমরা জানি না। কাম চরিতার্থ করিবার জন্য দিন, ক্ষণ, সময়, অসময় বিবেচনা না করিয়া স্ত্রী গমন করিয়া থাকি, তাহাতে যে কত অনিষ্ট হয় তাহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। আমাদের কাম চরিতার্থ হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হই। একজন রসিক কবি লিখিয়াছেন ঃ—

খোকা বাপের ছেলে আমি।
মুড়্কী খাই ধামী ধামী॥
মা আমার গৌরীদানের মেয়ে।
চেহারা তোম্‌রা দেখ না চেয়ে॥

চেহারা—হাত শলি শলি,
দু পা নলী নলী,
চোখে পিঁচ্টি মাখা,
কেলে হাঁড়ি মাথা,
খুস্‌কি উকুনের ডালা,
পেট্‌টী ঢাকাই জালা॥

এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ উদর ভাণ্ডে কত প্রকার যে জীব বাস করে তাহার সংখ্যা নাই; প্লীহা যকৃত, কাঁসর, ঘণ্টা, নানাপ্রকার সরীসৃপ, আরও কত কি তাহা বলা যায় না। অদিনে, অসময়ে স্ত্রী গমনের ফল এইরূপ। আর বাল্য বিবাহের ফলও এইরূপ বটে। এইরূপ জীবের দ্বারা পিতা মাতার বা দেশের কোন

উপকার হয় না। ইহারা কেবল জগতের ক্ষয়ের জন্যই উদ্ভব হয়। কিন্তু এইরূপ ফলের জন্য যে নব বিবাহিত দম্পতীগণ দায়ী, তাহা নহে। তাহারা অশিক্ষিত অবস্থায় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, কাম কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। কামকে দমন করিতে তাহারা না পিতা মাতার কাছে শিক্ষা করিয়াছে, না বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়াছে। কাম স্বভাবতই নিম্নগামী ও পতনশীল। জীবকে কেবল পতনের দিকে, অর্থাৎ ধ্বংসের দিকেই লইয়া যায়। এই ধ্বংসকারী কামকে নিম্নগামী হইতে ঊর্দ্ধগামী ও পতনশীল হইতে স্থিতিশীল করিতে হইবে। কামের বশীভূত হইয়া কার্য্য না করিয়া তাহাকে স্ববশে রাখিতে হইবে, কেবল সন্তান সন্ততি উৎপাদনের জন্য তাহার সাহায্য লইতে হইবে। অন্য সময় তাহাকে দমনে রাখিতে হইবে। কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটীই নরকের (অশান্তির) দ্বারস্বরূপ। জীবের যত কিছু অনিষ্ট, তাহা এই তিনটী দুর্জ্জয় রিপুর দ্বারা সাধিত হয়; কিন্তু কামও দেহেতে থাকা চাই; অন্যথা সৃষ্টি নাশ হইয়া যাইবে।

স্বয়ং ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

'প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ।'

ইতি গীতা ১০ ম অঃ ২৮ শঃ।

অর্থাৎ আমি প্রজাগণের উৎপত্তি হেতু কন্দর্প, অর্থাৎ জীবদেহে তিনি কামরূপে প্রজা উৎপত্তির জন্য আছেন। জীব কামের সহায়ে প্রজা উৎপন্ন করিবে, কেবল সেইজন্য জীবদেহে তাহার থাকা আবশ্যক। কামের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইবে সেজন্য নয়। প্রজা উৎপত্তি করা ভগবানের ইচ্ছা, এই জন্য কামের সহায়ে মৈথুন ক্রিয়া দ্বারা প্রজা উৎপত্তি করিতে হয়, অন্যথা সৃষ্টি নাশ হইয়া যাইবে।

কামের কথা যখন এস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন কাম সম্বন্ধে যে একটী পৌরাণিক গল্প আছে তাহার গূঢ় অর্থ প্রকাশ করা অন্যায় হইবে না মনে করিয়া পাঠকদিগের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করিতেছি।

কন্দর্প, কাম ও মদন এ তিনটী একই শক্তির নাম, কেবল কার্য্যভেদে নামের প্রভেদ মাত্র। এই কামদেবের স্ত্রীর নাম রতিদেবী। আর একটী দেবতা আছেন তাঁহার নাম মহাদেব, অর্থাৎ ইনি সকল দেবতার প্রধান। ইঁহারা কেহই অস্থি মাংস বিশিষ্ট দেহধারী জীব নহেন। ইঁহারা সকলেই

বায়ুরূপী। ইঁহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র কাজ জীবদেহে নির্দিষ্ট আছে। ইঁহারা জীবদেহেই বাস করিয়া নিজ নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। জীবদেহে কুটস্থেই ব্রহ্ম জ্যোতির প্রকাশ। সাধক ষট্‌চক্রের ক্রিয়া দ্বারা সেই জ্যোতিতে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে তাঁহাকে স্পর্শ করিবার কিম্বা তাঁহার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবার কোন রিপুরই শক্তি থাকে না। যে কোন রিপু তাহা করিতে যাইবে,সেই রিপুই ব্রহ্ম জ্যোতিতে ভস্ম হইয়া যাইবে। যেমন সর্ব্বব্যাপী আকাশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবার অথবা তাহাকে স্পর্শ করিবার কাহারও শক্তি নাই, ইহাও তদ্রূপ। সাধকরূপী মহাদেব যখন ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সেই ব্রহ্ম জ্যোতিতে স্থিতি লাভ করেন, তখন তাঁহার আর পৃথক সত্তা বোধ থাকে না। সেই অবস্থাপন্ন সাধকরূপী মহাদেবের উপর বায়ুরূপী মদন, তাঁহার দুর্জয় প্রতাপ বিস্তার করিতে গিয়া, সেই ব্রহ্ম জ্যোতিতে দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইয়া গেল। কারণ যিনি ব্রহ্ম জ্যোতিতে স্থিতি লাভ করিয়াছেন তাঁহার উপর ত্রিগুণোদ্ভব কোন রিপুরই প্রাধান্য থাটে না। সেই স্থানটী গুণাতীত স্থান, পঞ্চতত্ত্বের অতীত স্থান। বায়ুরূপী মদন সেই তত্ত্বাতীত স্থানে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিতে গিয়া ধ্বংস হইয়া গেল। ইহারই নাম মদন ভস্ম। বস্তুতঃ কোন দেহধারী মহাদেব নামীয় জীব, হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা করিবার সময় মদন কর্ত্তৃক তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হওয়ায়, তাঁহার ললাট দেশ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত করিয়া মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, ইহা কেবল সাধনাবিহীন অজ্ঞ লোককে বুঝাইবার জন্য কবির কল্পনা প্রসূত একটী মনোহর গল্প মাত্র। জীবদেহে ললাট প্রদেশই সর্ব্বোচ্চ স্থান, সেই জন্য ললাটকে হিমালয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর ললাট প্রদেশেই কুটস্থ গহ্বর, সেই স্থানেই ব্রহ্ম জ্যোতির স্থান, সেই জ্যোতিকে অগ্নিশিখারূপে বর্ণিত করা হইয়াছে।

মদন ভস্মের পরেই রতিবিলাপ আরম্ভ হইল। রতির পতি মদন যখন ভস্ম হইয়া গেল, তখন পতির অভাবে বায়ুরূপী রতির শোক উপস্থিত হইল, কেন না মদনের অভাবে কে আর তাঁহাকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিবে? সেই শোকের নাম রতি বিলাপ। ইহাই মদন ভস্মের ও রতি বিলাপের গূঢ় অর্থ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মদন, কন্দর্প ও কাম এই তিনটী একই শক্তির নাম, কেবল কার্য্যভেদে নামের প্রভেদ মাত্র। আমরা মদন ভস্মের বিষয়

বলিয়াছি, এইবার কামের বিষয় বলিব। কাম শব্দের অর্থ কামনা, বাসনা বা ইচ্ছা। এই ইচ্ছাকেই (কামকেই) চণ্ডীতে রক্তবীজ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ রক্তবীজ নামে কোন জীবের অস্তিত্ব নাই। জিহ্বার সংযমে ইচ্ছার (কামের) নাশ হয়। জিহ্বাকে উল্‌টাইয়া তালু কুহরে প্রবেশ করাইয়া সাধন করিলে ইচ্ছার নাশ হয়। সেই ইচ্ছার (কামের) নাশে রক্তবীজের নাশ কিরূপে হয়, তাহা কালী মূর্ত্তিতে দেখান হইয়াছে। কালী— যিনি কালকে জয় করিয়াছেন, তিনিই কালী। কালীর প্রতিমূর্ত্তিতে মহাকাল ধরাতলে শায়িত আছেন, আর তাঁহার বক্ষস্থলের উপর কালী জিহ্বা লম্বিত করিয়া দন্তের দ্বারা কামড়াইয়া দণ্ডায়মান আছেন। ইহার গূঢ় ভাব এই যে, কালী মহাকালকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া তাঁহাকে পদতলস্থ করিয়াছেন। আর লম্বিত জিহ্বার অর্থ এই, যে জিহ্বার সংযমে ইচ্ছার নাশ হয়, ইচ্ছার নাশ হইলেই কালকে জয় করা যায়। আর কালকে জয় করিতে পারিলেই জীবের মুক্তি হয়। প্রতিমূর্ত্তিতে জিহ্বাকে যথাস্থানে স্থাপন করা দেখান যায় না, এই হেতু জিহ্বাকে লম্বিত করিয়া দন্তের দ্বারা কামড়ান দেখান হইয়াছে। জিহ্বার সংযমে ইচ্ছারূপ রক্তবীজের (কামনার) বধ (নাশ) হইলে কালকে জয় করিতে পারা যায় তাহাই কালীমূর্ত্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাসনা, কামনা বা ইচ্ছা সত্তে জীবের মুক্তি নাই। সেই কামরূপ ইচ্ছাকে রক্তবীজ রূপে বর্ণিত করিয়া, তাহার বধ কিরূপে হয় তাহাই চণ্ডীতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

আমরা মদন ভস্মের, রতি বিলাপের ও কামরূপী রক্তবীজ বধের গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মূল বক্তব্য হইতে একটু পথভ্রষ্ট হইয়াছি, কিন্তু এরূপ পথভ্রষ্ট হওয়া অনিবার্য্য কারণ মধ্যে মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থলে এরূপ বলিতে হয়। যাহা হউক আমরা বলিতেছিলাম যে কামের সহায়ে মৈথুন ক্রিয়া দ্বারা জীব উৎপন্ন করা ভগবানের অভিপ্রেত, সেইজন্য কামদেহে থাকা আবশ্যক, কিন্তু ইহার অপব্যবহার করাই দোষ। কাম দেহে থাকিলেই মধ্যে মধ্যে মৈথুন ক্রিয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা দোষাবহ নহে, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত। আগমসারে উক্ত আছে—

মৈথুনং পরমং তত্ত্বঃ সৃষ্টি স্থিত্যন্ত কারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধিঃ ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥

অর্থাৎ মৈথুন শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, মৈথুন সৃষ্টি, স্থিতি এবং অন্তের কারণ। মৈথুন হইতে সিদ্ধাবস্থা লাভ হয় এবং সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। আমরা

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদের সকল শাস্ত্রই দুই অর্থে লেখা, একটী গূঢ় বা সূক্ষ্ম অর্থ, আর একটী সাধারণ বা স্থূল অর্থ। আমরা মদন তত্ত্বের ও কাম নামীয় ইচ্ছা রূপ রক্তবীজ বধের গূঢ় অর্থ ইহার পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। তদ্রূপ মৈথুন তত্ত্বেরও দুইটী অর্থ আছে, সূক্ষ্ম ও স্থূল। সূক্ষ্ম মৈথুন কি এবং কি প্রকার তাহা এস্থলে আমাদের বর্ণনীয় বিষয় নয় বোধে তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। তবে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সূক্ষ্ম মৈথুন ক্রিয়ার ফলে, এই স্থাবর জঙ্গমাদি রূপাত্মক জগতের ক্রম বিকাশ হইয়াছে; এবং সেই বিকাশমান জগৎকে নাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, ভগবান প্রত্যেক জীবদেহে কামরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া জীবকে স্থূল মৈথুন কার্য্যে রত করান এবং তাহা হইতে প্রজা উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টি রক্ষা হয়। নতুবা সৃষ্টি লোপ পাইয়া যাইত।

যাঁহারা অত্যন্ত কামাসক্ত তাঁহারা বলেন যে শাস্ত্রে যখন লেখা আছে মৈথুন ক্রিয়া শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, তখন আর উহাতে বিধি নিষেধ কিছুই মানিবার আবশ্যক নাই, যত সাধ্য এই কার্য্যে রত হওয়া ভাল, তাহা হইলে সিদ্ধাবস্থা ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। এই যুক্তির সহায়ে তাঁহারা সময়, অসময় বিচার না করিয়া এই কার্য্যে রত হন। তাহার ফলে যত নর পশু উৎপন্ন হইয়া জগতের ও সমাজের মহা অনিষ্টের কারণ হয়। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া কার্য্য করিলে এরূপ হয় না। শাস্ত্রে এইরূপ আর একটী বিষয় উল্লেখ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ না জানিয়া কার্য্য করিয়া আমরা অধঃপাতে যাই। শিব সংহিতায় উক্ত আছে—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পতিত ভূতলে,
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

অর্থাৎ পান কর, পান কর, পুনরায় পান কর, যতক্ষণ না ভূতলে পতিত হও, পুনরায় উঠিয়া পুনরায় পান কর, তাহা হইলে আর পুনর্জন্ম হইবে না। যাঁহারা অত্যন্ত মদ্যপায়ী তাঁহারা বলেন যে শাস্ত্রে যখন লেখা আছে পান করিলে পুনর্জন্ম হয় না, তখন যত পার পান কর তাহা হইলে আর পুনর্জন্ম হইবে না। শাস্ত্রে কি আর গঙ্গা বারি পান করিবার কথা লিখিয়াছে? ইহা কারণ বারি অতএব যত পার—পেট ভোরে এন্তার মদ খাও। এইরূপ অর্থ না করিলে তাঁহাদের মদ্য পান করিবার সুবিধা হয় না। এইরূপে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তাঁহারা আকণ্ঠ মদ্য পান করিয়া অধঃপাতে যান। বস্তুতঃ

ইহা প্রকৃত অর্থ নয়। এস্থলে অমৃত পান করিবার কথা বলা হইয়াছে। যাহা পান করিলে জীব অমরত্ব লাভ করে। মনুষ্যের মস্তকে যে সহস্রার পদ্ম আছে তাহা হইতে অমৃত নিঃসৃত হয়, সেই অমৃত পুনঃ পুনঃ পান করিলেও আশা মিটে না, এইরূপ পুনঃ পুনঃ পান করিয়া অমরত্ব লাভ হয়। গুরু পান করিবার কৌশল উপযুক্ত শিষ্যকে দেখাইয়া দেন। এখানে মদ্য পান করিবার কথা বলা হয় নাই। আমাদের বিকৃত মস্তিষ্ক, বিপরীত ভাবে অর্থ করিয়া, বিপরীত ভাবে কার্য্য করিয়া অধঃপাতে যাই। এইরূপে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ না জানিয়া আমরা সকল কার্য্যই করিয়া থাকি, এবং ফলও তদ্রূপ পাইয়া থাকি। সেইরূপ মৈথুন ক্রিয়ারও প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইয়া, সময় অসময় বিচার না করিয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহাতে সুফল না পাইয়া কুফলই পাইয়া থাকি।

আমাদের শস্যক্ষেত্র হইতে উৎকৃষ্ট এবং প্রচুর ফলমূলাদি উৎপন্ন করিবার জন্য ক্ষেত্রে কত প্রকার সার মাটী দিয়া থাকি, কত প্রকার তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকি, কত প্রকার বিধি নিষেধ মানিয়া থাকি, কিন্তু আমরা এতই অপরিনামদর্শী যে, যে ক্ষেত্র হইতে সন্তান সন্ততিরূপ ফল উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষেত্র হইতে কি উপায়ে উত্তম সন্তানসন্ততি উৎপন্ন হইবে, তাহার জন্য আমরা কোন উপায়ই অবলম্বন করি না, সেই জন্য আশানুরূপ ফলও পাই না। শস্য ক্ষেত্র হইতে উৎকৃষ্ট শস্যাদি উৎপন্ন করিবার যেরূপ বিধি নিষেধ আছে উৎকৃষ্ট সন্তানসন্ততি উৎপন্ন করিবারও সেইরূপ বিধিনিষেধ আছে, সেইগুলি না মানিয়া চলিলেই দুঃখ, শোক ও মনস্তাপের কারণ হয় মাত্র। তখন আমরা ভাগ্যের দোষ দিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকি।

শস্যাদি উৎপন্ন করিবার বিধি নিষেধ এবং কৌশল সকল আমরা খনার বচনে যথেষ্ট পাই, এবং সেই সকল মানিয়া যথেষ্ট ফল পাইয়া থাকি। খনার বচন এই স্থলে আমরা দুই একটী উল্লেখ করিব। খনা বলিয়াছেন—

ভাদ্র মাসে রুয়ে কলা,
সবংশে মোলো রাবণ শালা।

ইহার অর্থ ভাদ্র মাসে কলার বীজ রোপন করিলে রোপন কর্ত্তার বংশ নাশ হয়, অথবা অত্যন্ত অনিষ্ট হয়, এই জন্য চাষিরা ভাদ্র মাসে কলার বীজ রোপন করে না। আর এক স্থানে খনা বলিতেছেন—

ডাক ছেড়ে বলে রাবণ,
কলা লাগাবে আষাঢ় শ্রাবণ॥

ইহাতে বুঝিতে হইবে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কলার বীজ রোপণ করা উচিত, তাহা হইলে প্রচুর কলা উৎপন্ন হয়। আর এক স্থানে বলিয়াছেন—

কলা রুয়ে না কাট্‌বে পাত।
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে কলার গাছ রোপন করিয়া যদি তাহার পাতা না কাটা হয়, তাহা হইলে এত কলা ফলে যে তাহাতে ভাত এবং কাপড়ের সংস্থান হয়। এই সকল বিধি নিষেধ চাষিরা মানিয়া চলে, এই জন্য তাহারা যথেষ্ট ফল পাইয়া থাকে। সেইরূপ সন্তানসন্ততি উৎপন্ন করিবারও অনেক বিধি নিষেধ আছে, সেই সকল যদি আমরা মানিয়া চলি তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুশ্রী, সুবুদ্ধি ও নীরোগী সন্তানসন্ততি লাভ করিতে পারি। কিন্তু আমরা সেই সকল না মানিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হই বলিয়া, কেবল নরপশু উৎপন্ন হইয়া পিতা মাতার ও সমাজের অশান্তির কারণ হয় মাত্র। আর বিধি নিষেধগুলি মানিয়া চলিবই বা কেমন করিয়া? ইহার অগ্রে যে কলা রোপন করিবার বিধি নিষেধগুলি উল্লেখ করিলাম, সেই কলাটী সুমধুর বলিয়া আমরা বহুদিন পূর্ব্বে ভক্ষণ করে বসে আছি। তাহাও এক রকম নয়, কাঁচা, পাকা, ভাজা ও কলাপোড়া, ঠেসে খেয়ে পেট্‌টী নিরেট করে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মাথাটীও নিরেট করে বসে আছি। এখন কি আর আমাদের সুশ্রী, সুবুদ্ধি, সন্তানসন্ততি উৎপন্ন করিবার বিধিনিষেধ মানিতে ভাল লাগে? আর সে সকল মানিবার অবসরই বা কোথা? কামদেবের উত্তেজনায় সে সকল বিচার করিবার সময় পাই না। কামকে তৃপ্তি করিতে পারিলেই ছুটী! বিচার আচার প্রয়োজন কি? আমরা এই প্রকার যুক্তি করিয়া থাকি।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহু ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥

গীতা ১৩শ অঃ, ১ম শঃ।

অর্থাৎ হে কৌন্তেয় এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, যিনি ইহাকে তত্বতঃ জানেন, ক্ষেত্রবিদ্‌গণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন।

এই শরীররূপ ক্ষেত্র প্রাণরূপ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিলে জ্ঞান উৎপন্ন

হয়। ইহাই কৃষিকার্য্য। তাই সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার একটী সঙ্গীতে বলিয়াছেন—

মন তুমি কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জন্ম রইল পতিত,
আবাদ করলে ফোল্‌তো সোণা।

রাজর্ষি জনক এইরূপ ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া সীতা নাম্নী কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। সীতা অর্থে আত্মবিদ্যা। অর্থাৎ তিনি দেহরূপ ক্ষেত্রকে প্রাণরূপ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিয়া, অর্থাৎ প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা আত্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে রাজর্ষি জনক ক্ষেত্রে চাষ করিবার সময় লাঙ্গলের মুখে সীতাকে পাইয়াছিলেন, তাই সীতাকে জনকসুতা বলা হয়। বস্তুতঃ ইহা প্রকৃত কথা নয়। ইহা সাধনাবিহীন অজ্ঞ লোককে বুঝাইবার জন্য কবির কল্পনাপ্রসূত একটী গল্প মাত্র। প্রাণায়াম ক্রিয়াদ্বারা জীবদেহে জ্ঞান, বিজ্ঞানের উন্মেষ হয়। পুস্তক পাঠ করিয়া ইহা শিক্ষা করা যায় না। ইহা সদ্‌গুরু বক্ত্র গম্য। সে যাহা হউক, আমরা ক্ষেত্রের কথা বলিতেছিলাম। ক্ষেত্র দুই প্রকার, পুরুষচিহ্ন বিশিষ্ট শরীর এক প্রকার ক্ষেত্র, আর নারী চিহ্ন বিশিষ্ট শরীর আর এক প্রকার ক্ষেত্র। পুরুষ চেতনাবান্‌, নির্গুণ ও অবীজ ধর্ম্মা, আর নারী বীজধর্ম্মিণী প্রসবধর্ম্মিণী। সূর্য্যের কিরণও সূর্য্যমণির সংযোগে যেমন অগ্নি জন্মে, সেইরূপ পুরুষের শুক্র আর নারীর আর্ত্তব শোণিত সংযোগে জীব উৎপন্ন হয়। স্থূল মৈথুন ক্রিয়া দ্বারা পুরুষের শরীর হইতে শুক্র নির্গত হইয়া নারীর যোনিতে পতিত হইলে আর্ত্তব শোণিতে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ভ্রূণ পরিণত হয়, এবং ক্রমে আর্ত্তব শোণিতের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া যথাসময়ে নারী প্রসব করেন। যেমন স্বাতী নক্ষত্রের জল বংশে পতিত হইলে বংশলোচন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শুভক্ষণে সুনক্ষত্রে ক্ষেত্রে বীজ পড়িলেই উৎকৃষ্ট জীব উৎপন্ন হয়। মৈথুন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দিন, ক্ষণ, নক্ষত্র দেখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সুফল পাওয়া যায়। ইহা কিছুই কঠিন কার্য্য নয়, অনায়াসেই করিতে পারা যায়। মৈথুন ক্রিয়ার যে সকল বিধি নিষেধ আছে সেইগুলি এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যাঁহারা নিজ নিজ সংসারের মঙ্গল কামনা করেন, যাঁহারা সুবুদ্ধি এবং সুশ্রী সন্তানসন্ততি কামনা করেন তাঁহারা সেই বিধি নিষেধগুলি মানিয়া চলিলে যথেষ্ট সুফল পাইবেন, তাঁহাদের সংসার মঙ্গলময় হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

স্ত্রীলোকের দ্বাদশ বৎসরের পর হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মাসে স্বভাবতঃ রজো নিঃসরণ হইয়া থাকে। রজো নিঃসরণ দিবস হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণের যোগ্য সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। রজঃস্বলা স্ত্রীকে প্রথম দিন চণ্ডালিনীবৎ, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনীবৎ, এবং তৃতীয় দিনে রজকীবৎ বর্জ্জন করিবে। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিলে আয়ু ক্ষয় হয় এবং উক্ত দুই দিনে যে গর্ভ উৎপন্ন হয় তাহা রক্ষা পায় না। তৃতীয় দিবসে স্ত্রী সঙ্গম দ্বারা যে গর্ভ জন্মে, তাহা অল্পায়ু ও বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে। অতএব প্রথম তিন রাত্রি রতি ক্রিয়ায় বিরত থাকা উচিত। চতুর্থাদি দিবসেও যদি রজঃস্রাব নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে রতিক্রিয়া নিষিদ্ধ। ফল কথা যতদিন না রজঃস্রাব নিবৃত্ত হয় ততদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম উচিত নয়। স্ত্রী সঙ্গমের প্রশস্ত দিন চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশীর রাত্র। কিন্তু এই সকল দিনেও যদি রজোনিঃসরণ স্থগিত না হয় তাহা হইলে সঙ্গম নিষিদ্ধ। দিবসে স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধ। চতুর্থ দিবসে যদি রজঃস্রাব নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে গর্ভধানোক্ত বিধানানুসারে স্ত্রী গমন করিলে, আয়ু, ষষ্ঠী রাত্রে আরোগ্য, অষ্টমীতে প্রজা সৌভাগ্য, দশমী রাত্রে ঐশ্বর্য্য এবং দ্বাদশী রাত্রে ধনলাভ হইয়া থাকে। যুগ্ম রাত্রে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে পুত্র আর অযুগ্ম রাত্রে কন্যা জন্মে। আর শুক্র শোণিতের অত্যল্পতা নিবন্ধন নপুংসক জন্মে। আর ভার্য্যাকে উপরে উঠাইয়া মৈথুন করাইলে নপুংসক জন্মে।

স্ত্রী সম্ভোগের দিন স্ত্রী পুরুষ উভয়ে স্নান করিয়া গাত্রে চন্দন মাখিয়া, সুগন্ধ কুসুমে সুবাসিত হইয়া উত্তম বেশভূষা পরিধান করিয়া এবং শুক্রজনক দ্রব্য আহার করিয়া সুবাসিত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে সুখজনক শয্যায় স্ত্রীতে উপগত হইলে মনোমত ফল পাওয়া যায়।

রজস্বলা ব্যাধিমতী বিশেষতঃ যোনি রোগিনী, গর্ভবতী স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিলে পুরুষের অনেক রোগ জন্মে। স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও সেই প্রকার নিয়ম, অর্থাৎ ব্যাধিগ্রস্থ পুরুষের সাহিত সহবাস করিলে ব্যাধিযুক্ত হইতে হয়। জ্ঞানী ভীষকগণ বলেন, উল্টো রতি নিষিদ্ধ; কারণ ইহাতে নানা ব্যাধি জন্মে। উদাহরণ স্বরূপ একটী বলিতেছি—

"উল্টো রতি করে যে,
শিলারোগে মরে সে।"

অতএব এ কার্য্যে বিরত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

রজস্বলা নারীর সম্বন্ধেও কতকগুলি বিধিনিষেধ আছে; সেগুলি জানিয়া রাখা তাঁহাদের বিশেষ আবশ্যক। সেগুলি মানিয়া চলিলে বিশেষ উপকার হয়। রজস্বলা নারী রজোনিঃসরণের দিন হইতে তিন দিন হিংসা করিবে না। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, কুশাসনে শয়ন করিবে। পতিকে দর্শন করিবে না। পত্রে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। অশ্রুপাত, নখচ্ছেদ, তৈল মর্দ্দন, অনুলেপন, নেত্রে অঞ্জন, স্নান, দিবানিদ্রা, উচ্চ শব্দ শ্রবণ, হাস্য, বহু কথন, পরিশ্রম, ভূমি খনন, প্রবল বায়ু সেবন পরিবর্জ্জন করিবে। জ্ঞান বশতঃই হউক কিম্বা অজ্ঞান বশতঃই হউক কিম্বা দৈব বশতঃই হউক, রজস্বলা নারী রোদন করিলে গর্ভ দোষ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশুর বিকৃত লোচন হয়, নখচ্ছেদে কুনখী হয়, তৈল মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠী হয়। অনুলেপনে ও স্নানে দুঃখশীল হয়। ছুটাছুটীতে চঞ্চল, অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণে বধির হয়, বহু কথনে প্রলাপী হয়। হাস্য করণে শিশুর তালু, দন্ত, ওষ্ঠ ও জিহ্বা শ্যামবর্ণ হয়। ভূমি খননে স্খলিত হয়। পরিশ্রমে ও বাত সেবনে উন্মত্ত হয়, সুতরাং এ সকল বর্জ্জনীয়।

রজস্বলা স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়া প্রথমে যেরূপ ব্যক্তিকে দর্শন করিবে সেইরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে। অতএব ঋতু স্নান করিয়া প্রথমে পতি, অথবা পুত্র কিম্বা কোন প্রিয় ব্যক্তিকে দর্শন করা উচিত।

মৈথুন বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে সম্মত ও হর্ষযুক্ত হইয়া এবং হিতকর রসাল ও তৃপ্তিকর খাদ্য ভোজন করিয়া সুখকর ও সুচারু দর্শন শয্যায় গমন করিবে। পুরুষ দক্ষিণ ও স্ত্রী বাম পদে শয্যায় আরোহণ করিবে এবং 'অহিরসি আয়ুরসি' মন্ত্র পাঠ করিয়া সহবাসে প্রবৃত্ত হইবে। যেমন মনে, এবং যেমন ভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া রমণ করিবে, সেইরূপ পুত্র লাভ হইবে। ভীষকগণ বলেন,—

"যেমন ভাবে করেন রতি
তেমনি পুত্র পান দম্পতী"

মহাভারতে উক্ত আছে, ধৃতরাষ্ট্রের মাতা রাণী অম্বিকা দেবী মহর্ষি ব্যাসদেবের সহিত সহবাস কালীন তাঁহার দেহের উগ্রগন্ধ ও অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া তাঁহার সহিত সহবাস করিয়াছিলেন, এইজন্য ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর পাণ্ডু রাজার জননী রাজমহিষী অম্বালিকা ব্যাসদেবের সহিত সহবাস

করিবার সময় তাঁহার অদৃষ্ট পূর্ব্ব ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভীত ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া তাঁহার সহিত সহবাস করিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি পাণ্ডু-বর্ণ কুমার প্রসব করিয়াছিলেন, এবং ব্যাসদেবেরই অনুজ্ঞানুসারে তাঁহার নাম পাণ্ডু রাখা হইয়াছিল। ভীষ্ম জননী সত্যবতী আর একটী পৌত্র লাভের প্রত্যাশায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ বধূ অম্বিকার পুনর্ব্বার ঋতুকাল উপস্থিত হইলে দেবর ব্যাসদেবের সহিত সহযোগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অম্বিকা দেবী দেবর ব্যাসদেবের গাত্রের উগ্র গন্ধ ও বিরাট মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া শ্বশ্রূর আদেশ পালন করিতে সম্মত না হইয়া, তিনি পরমাসুন্দরী এক দাসীকে স্বীয় বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া, দেবরের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দাসী ব্যাসদেবের নিকটে গমন করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া অতিশয় আনন্দচিত্তে তাঁহার সহিত সহবাস করিয়াছিল। সেই প্রীতমনে সহবাসের ফলে সেই দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম হইয়াছিল। বিদুর পরম ধার্ম্মিক, ন্যায়পরায়ণ, অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান এবং সকল বিষয়ে উদাসীন ও স্বার্থহীন হইয়া জন্মিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, যেমন ভাবে শয়ন করিয়া, আর যেমন মনের ভাব লইয়া রতি করা হয়, তদনুরূপ পুত্র লাভ হয়। মৃত্যুকালেও সেইরূপ, অর্থাৎ যেরূপ মনের অবস্থাতে প্রাণ ত্যাগ হয়, পরজন্মেও সেইরূপ মনের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমরা কথায় বলি "যার যেমন মতি তার তেমন গতি"। রাজা ভরত মৃত্যুকালীন তাঁহার হরিণের চিন্তা করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন; সেইজন্য তিনি হরিণ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥

গীতা ৮ম অঃ, ৬ শঃ।

অর্থাৎ যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে লোক দেহত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে (ভাবনায়) চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় তাহারা সেই সেই ভাব পায়।

রমনকালে স্ত্রী ন্যুব্জ বা কুব্জ অথবা পার্শ্বগত হইয়া শয়ন করিবে না। এই

-ভাবে শয়ন করিলে যোনি বীজ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না ; সুতরাং কোন ফলও হয় না। চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া বীজ গ্রহণ করিলে ফলদায়ক হয়।

মৈথুন অন্তে মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে, তাহাতে মৈথুন জনিত শ্রম ক্লান্তি ও আয়ুক্ষয় নিবারণ হয়। ইহা অবশ্য করা কর্ত্তব্য। ভিষকগণ বলেন—

"রতি ক্রিয়া পরে পুনি।
দুধ খাবে দিয়া চিনি ॥"

এইরূপ শাস্ত্রের বিধি নিষেধ বিস্তর আছে, সেগুলি মানিয়া কার্য্য করিলে এবং না মানিয়া কার্য্য করিলে তাহার যে ফলাফল, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যেগুলি অত্যাবশ্যক সেইগুলি শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে বিস্তারিত লিখিতে বিরত হইলাম।

শাস্ত্র সকল অভ্রান্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কেবল বিধি নিষেধগুলি প্রকৃত ভাবে করার অভাবে সেগুলি ফলবতী হয় না। ইদানীং প্রকৃত গুরুর অভাবে যোগশিক্ষা এক প্রকার দুর্ল্ভ হইয়াছে। সুতরাং সকলকার পক্ষে তাহা শিক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কচিৎ কেহ পুণ্যবলে শিক্ষা করিয়া এবং তাহা সাধন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন। সুতরাং যোগ শিক্ষা করিয়া কার্য্য করিবার যদি সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত না হয়, তবে উপরোক্ত বিধি নিষেধ অনুসারে কার্য্য করিলে যে যথেষ্ট সুফল লাভ হইবে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শাস্ত্রের বিধি নিষেধগুলি মানিয়া চলিলে আয়ু, বল, আরোগ্য, সৌভাগ্য লাভ করিয়া চির শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারা যায়, অন্যথা দুঃখে মনস্তাপে আমরা যেমন কালাতিপাত করিতেছি সেই রূপই চিরকাল করিব। ভাগ্যের দোষ দেওয়া কেবল অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। সকলই আমাদের সাধ্যায়ত্ত, কেবল দৈহিক ক্লেশের ভয়ে, আলস্যে এবং অবসাদে না করিয়া নিজের দুঃখ ও মনস্তাপ নিজেই সৃজন করিয়া থাকি। অনেকে আবার ঐ সকল বিধিনিষেধ মানিয়া চলিয়াও কোন ফল পান না। কেহ কেহ পুত্রকন্যা লাভে এককালীন বঞ্চিত হইয়া চির মনস্তাপ ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া অপত্য অভাবে যারপরনাই মনকষ্ট ভোগ করিতেছেন। কিন্তু ভাগ্যকে একবার বিশেষরূপে নাড়াচাড়া দিয়া দেখা উচিত। তাঁহারা অপত্য লাভের জন্য যে বিশেষ কোন

চেষ্টা করিয়া থাকেন বলিয়া বোধ হয় না, কেবল ভাগ্যের দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহাদের সন্তানসন্ততি কেন যে হয় না তাহা বিশেষ করিয়া জানা উচিত ; এবং শাস্ত্রানুসারে তাহার প্রতিকারও করা উচিত। অপত্য না হইবার কারণ সমূহ শাস্ত্রে বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে, এবং তাহার প্রতিকারও যথেষ্ট আছে। কই, আমরা তো কখন শুনি নাই যে কেহ অপত্য লাভের অভিপ্রায়ে শাস্ত্র বিধানোক্ত কার্য্য করিয়াছেন? যদি কেহ বা করিয়া থাকেন, তাহা যে নিশ্চয়ই প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করা হয় নাই, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেক ধনবান লোকে অপত্য কামনা করিয়া যাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজাদি করাইয়া থাকেন, কিন্তু তাহা করাইয়াও কোন ফল পান না। তাহার কারণ যাঁহার দ্বারা যাগ যজ্ঞাদি করান হয়, তিনি প্রকৃত কর্ম্মী নয়, সেই জন্য সেই সকল দৈব ক্রিয়াতেও কোন ফল হয় না। যাঁহারা প্রকৃত যোগী তাঁহারাই যাগ, যজ্ঞ করিতে সক্ষম, অপরে সে সকল কার্য্য করিতে অক্ষম, সুতরাং কর্ম্ম কর্ত্তা ফললাভে বঞ্চিত হন। এবং শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধগুলি অলীক মনে করেন। কিন্তু মহাভারতে উক্ত আছে, রাজা দশরথ পুত্র কামনা করিয়া যজ্ঞ করাইয়া চারিটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

যে সকল কারণে অপত্য উৎপন্ন হয় না, তাহার কারণ পূর্ব্বে এক প্রকার বলা হইয়াছে, তাহা পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিলেও ক্ষতি নাই। ঋতুর চতুর্থ দিবস হইতে ষোড়শ রাত্র পর্য্যন্ত গর্ভধারণের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু তাহা হইলেও রজঃ সত্ত্বে স্ত্রী গমন নিষিদ্ধ। রজঃ সত্ত্বে স্ত্রী গমন করিলে জীব উৎপন্ন হয় না। তাহার কারণ, যেমন প্রবাহমান সলিলে তৃণ নিক্ষেপ করিলে তাহা স্রোতে ভাসিয়া যায়, সেই রূপ রজঃ সত্ত্বে সঙ্গম করিলে, বীজ বায়ু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া রজঃ শোণিতের সহিত অধঃদিকে গমন করে, সুতরাং বীজ যথাস্থানে রক্ষিত না হওয়া বিধায়, অঙ্কুরিত হয় না, এবং সেই কারণে অপত্য উৎপন্ন হয় না। প্রথম তিন দিনের মধ্যে স্ত্রী গমন করিলেও সেইরূপ ফল হয় এবং অন্য অন্য দোষও জন্মে। আর একটী বিশেষ কারণ আছে তাহা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। জানা থাকিলে অনায়াসে সাবধান হওয়া যাইবে ; সেই উদ্দেশে সেটীও এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি।

দেহের মধ্যে তিনটী প্রধান নাড়ী আছে, তাহাদের নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। ইড়া নাড়ী মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া দেহের বাম দিকে অবস্থান

করিতেছে। পিঙ্গলা মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া দেহের দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতেছে। আর সুষুম্না মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে। প্রাণবায়ু দিবারাত্রে পর্য্যায়ক্রমে ২॥০ দণ্ড কাল ইড়ায়ও ২॥০ দণ্ড কাল পিঙ্গলায় অবস্থান করে, আর ইড়া হইতে পিঙ্গলায় ও পিঙ্গলা হইতে ইড়াতে যাইতে যেটুকু সময় লাগে, সেইটুকু সময় মাত্র সুষুম্নায় অবস্থান করে, ইহা অতি অল্প সময়। এই সময়কেই মাহেন্দ্রক্ষণ বলা যায়। আর যোনি মুখে জরায়ু মধ্যে তিনটী নাড়ী আছে, তাহাদের নাম চান্দ্রমসি, সমীরণা আর গৌরী। চান্দ্রমসি জরায়ুর বামভাগে বামা নাড়ীর (ইড়ানাড়ী) সহিত সংযুক্ত। সমীরণা জরায়ুর মধ্যস্থলে সুষুম্নার সহিত সংযুক্ত। আর গৌরী নাড়ী জরায়ুর দক্ষিণ দিকে দক্ষিণা নাড়ীর (পিঙ্গলা নাড়ী) সহিত সংযুক্ত। যে সময় প্রাণ বায়ুর স্থিতি বামা নাড়ীতে থাকে সেই সময় ক্ষেত্রে বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে চান্দ্রমসি নাড়ীর মুখে পতিত হয়, এবং চান্দ্রমসি বামা নাড়ীর সহিত সংযুক্ত থাকায় বীজ বামাভাব প্রাপ্ত হইয়া কন্যা উৎপন্ন হয়। যে সময় প্রাণবায়ুর স্থিতি পিঙ্গলায় থাকে সেই সময় ক্ষেত্রে বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে গৌরী নাড়ীর মুখে পতিত হয়; গৌরী নাড়ী পিঙ্গলার সহিত সংযুক্ত থাকায় জীব পুরুষ চিহ্ন বিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আর প্রাণবায়ু যখন ইড়া হইতে পিঙ্গলায় এবং পিঙ্গলা হইতে ইড়ায় গমন করে, তখন কোন নাড়ীতেই প্রাণের স্থিতি না থাকা বিধায়, সেই সময় ক্ষেত্রে বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ তাহাতে জীব উৎপন্ন হয় না। অপত্য উৎপন্ন না হইবার এই একটী প্রধান কারণ। সন্তান সন্ততি উৎপন্ন করিবার বাধাবিঘ্ন, একটু স্থিরচিত্তে এবং স্থৈর্য্যতার সহিত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে অতিক্রম করা যায়। অবশ্য তাহার কৌশল সকল উন্নত অবস্থাপন্ন যোগ অভ্যাসীর নিকট জানিতে এবং শিক্ষা করিতে হয়, নচেৎ কোন ফল হয় না।

প্রাণী উৎপন্ন করিতে হইলে, প্রাণের সহায় আবশ্যক। প্রাণকে সহায় করিয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, প্রাণই অভিষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। পুরাকালে যোগীঋষিগণ আপনার ইচ্ছামত এবং আবশ্যক মত প্রাণকে আপনার দেহের যেখানে ইচ্ছা সেইখানে রাখিতে পারিতেন, এবং যে কার্য্যের জন্য যেখানে প্রাণকে স্থাপন করা আবশ্যক, সেই স্থানে প্রাণকে স্থাপন করিয়া প্রাণের অনুকূলে, সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং তাহাতেই অভিষ্ট ফল পাইতেন। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে যে এত শৌর্য্য বীর্য্যশালী নরদেবতা উৎপন্ন হইয়া-

ছিল তাহার প্রধান কারণ যোগবল। সেই সময়ের মহাত্মারা দিন, ক্ষণ, তিথি নক্ষত্র দেখিয়া, এবং প্রাণকে অবলম্বন করিয়া স্ত্রী গমন করিতেন, সেই কারণেই শৌর্য্যবীর্য্যশালী পুত্র এবং সীতা সাবিত্রীর ন্যায় কন্যা লাভ করিতেন। প্রাণকে দেহের যেখানে ইচ্ছা সেইখানে স্থাপন করা কিছু কঠিন কার্য্য নয়, দশমবর্ষের বালককে শিখাইয়া দিলে সেও অনায়াসে করিতে পারে। ইহাতে কোন কষ্ট নাই, পরিশ্রম নাই, কেবল পাঁচ মিনিট কাল স্থৈর্য্যতা ও ধৈর্য্যতার আবশ্যক। কিন্তু কে শিখাইবে? যোগী মহাত্মারা এ সকল বিষয় কাহাকেও শিক্ষা দেন না। শিক্ষা করিতে হইলে তাঁহাদের পথ অবলম্বন করিতে হয়।

সত্য বটে কাম দুর্দমনীয়। তাহার ক্ষমতা অদ্ভুত। কাম জীবকে উত্তেজিত করিলে জীবের স্থৈর্য্যতা ও ধৈর্য্যতা থাকে না। কিন্তু মনুষ্যতে ও পশুপক্ষীতে প্রভেদ থাকা উচিত। ভগবান মনুষ্যকে জ্ঞান দিয়াছেন, এবং সেই জ্ঞান দ্বারা সদসদ্ বিচার করিবার শক্তি দিয়াছেন। সেই বিচার শক্তির বলে কামের ক্ষমতাকে পরাভব করিতে পারা যায়। পূর্ব্ব হইতেই মনুষ্যের বিবেচনা করিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, কাম কেবল জীবকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। একজনের ধ্বংস অপর একজনের উৎপত্তি অনিবার্য্য। যদি ধ্বংস ও উৎপত্তি অনিবার্য্য হয়, তাহা হইলে ধ্বংস হইয়া যাহাতে উত্তম ফল উৎপাদন করিতে পারা যায় তাহাই করা উচিত। এই সারটুকু মনে রাখিয়া কামকে নিজ বসে রাখিয়া মুনি ঋষি কথিত বিধি বিধান অনুসারে সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে নরদেবতা সকল জন্মিয়া পিতা মাতার ও দেশের মঙ্গল বিধান করিবে; আর বিধি নিষেধগুলি না মানিয়া সৃষ্টি কার্য্যে রত হইলে, যত নর পশু উৎপন্ন হইয়া কেবল পিতা মাতা ও দেশের অশান্তির কারণ হইবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসও হইবে। ইহাতে লাভ কিছুই নাই। সুতরাং কি যুবা, কি প্রৌঢ়, অথবা এক কথায় যাঁহাদের অপত্য উৎপাদন করিবার শক্তি আছে, তাঁহাদের সকলকারই এই কথা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা উচিত যে, শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিলে তাঁহারা সুশ্রী ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন পুত্র কন্যা লাভ করিয়া চির শান্তি লাভ করিতে পারিবেন, নিজ নিজ সংসারকে মঙ্গলময় করিতে পারিবেন। যাঁহারা কামকে বসে রাখিতে একান্ত অসমর্থ, তাঁহারা যদি অন্ততঃ ঋতুর প্রথম দিন হইতে ষোড়শ রাত্র পর্য্যন্ত শাস্ত্র কথিত বিধি নিষেধগুলি মানিয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা অনেক জ্বালা যন্ত্রণা, রোগ, শোক, দুঃখ ও মনস্তাপ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবেন। কারণ পূর্ব্বে

বলা হইয়াছে, যে ঋতুর চতুর্থ দিবস হইতে ষোড়শ রাত্র পর্য্যন্ত গর্ভধারণের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, কেবল সেই ষোড়শ রাত্র মাত্র শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিলেও যথেষ্ট সুফল লাভ হইবে। কারণ অদিনে, অসময়ে ক্ষেত্রে বীজ নিক্ষিপ্ত না হইলে, নরপশু উৎপন্ন হইবে না, সুতরাং দুঃখ ও মনস্তাপেরও কারণ সৃষ্টি হইবে না। ষোড়শ রাত্রের পর হইতে পুনরায় ঋতু না হওয়া পর্য্যন্ত আপন ইচ্ছামত মৈথুন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে আর তত অনিষ্টকর হইবে না। অতএব সুবুদ্ধি যুবকগণ যাঁহারা পিতা মাতার ও দেশের আশা ভরসা, তাঁহারা যেন উপরোক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া আপনাকে ও পিতা মাতাকে সুখী করিতে পারেন সে বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কেবল যে যুবকের দলই এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন তাহা নহে, যাঁহাদের উৎপাদন করিবার শক্তি আছে তাঁহাদের সকলেরই এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ বলেন, হিন্দুদিগের অধঃপতন ও দুর্দ্দশার মূল কারণই উপর্য্যুপরি এবং বহুল সংখ্যায় নরপশুর উৎপন্ন হইতেই হইয়াছে। নরপশুর উদ্ভব স্থগিত হইলে, আর তৎসঙ্গে শৌর্য্য বীর্য্যশালী নরদেবতার উদ্ভব হইলেই ভারতবাসী স্বাধীন হইবে, আবার ভারতের গৌরবরবি উদয় হইয়া জগৎকে মোহিত করিবে। যে পথ অবলম্বন করিলে আমরা সেই অবস্থা লাভ করিতে পারি, সেই পথ অবলম্বন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। সেই অবস্থা লাভ করিতে হইলে যোগ পথই শ্রেষ্ঠ পথ। অন্যথা পুরাকালের মুনিঋষিগণ শাস্ত্রে নরদেবতা উৎপন্ন করিবার যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া নরদেবতা উৎপন্ন করিয়া ভারতের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। সেই সকল উপদেশানুসারে চলিলে আমরা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে যে অনেক উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারিব সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য উপস্থিত যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেছি, তাহাতে কোন কালেই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব না, তাহাতে রাজকর্ম্মচারীদের সহিত বিদ্বেষ ভাব ঘটিয়া আরও অনিষ্ট করিবে।

দেশের যাহারা আশা ভরসা, অর্থাৎ যুবকগণ তাহাদিগকে কোন দোষ দিতে পারা যায় না, কারণ শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধগুলি শিক্ষা করিতে তাহারা পিতা মাতার কাছে পায় না, বিদ্যালয়েও পায় না, পিতা মাতারাই যখন

শিক্ষা পান না, তখন তাঁহাদের পুত্র কন্যাকেই বা কেমন করিয়া শিক্ষা দিবেন? ফলে যুবকগণ অল্প বয়সে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শিক্ষার অভাবে স্ত্রীর সহিত যথেচ্ছাচার ব্যবহার করিয়া অভেদ্য দুঃখের জালে জড়িত হইয়া, আজীবন কষ্ট পাইয়া থাকে। পুরাকালে বালক বালিকাগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সংযমী হইয়া সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিত, তাহাতে স্ত্রী পুরুষের যথেচ্ছা ব্যবহার রহিত হইয়া পিতা মাতার ও দেশের অনেক কল্যাণ সাধন হইত। এখন শিক্ষার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে এবং তৎসঙ্গে সকল কার্য্যেরই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখনকার শিক্ষা কেবল অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা, ইহাতে আত্মসংযমের বা আত্মোন্নতির কোন ব্যবস্থাই নাই, ফলে অসংযমী যুবকগণ অল্প বয়সে ভার্য্যা গ্রহণ করিয়া আপনাকে অসীম দুঃখসাগরে নিমগ্ন করে।

সংসার আশ্রমে থাকিতে হইলে অর্থ চাই, অর্থ উপার্জ্জন যেমন আবশ্যকীয় কার্য্য, আত্মোন্নতিও সেইরূপ আবশ্যকীয়; কিন্তু সেদিকে আমাদের একবারেই লক্ষ নাই। পিতা মাতা পুত্রের বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু বধুর সহিত পুত্র কিরূপ ব্যবহার করিবেন সে সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশগুলি পুত্রকে শুনাইতে লজ্জা বোধ করেন। অবশ্য লজ্জা হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু ইহা শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যকীয়, কারণ এই শিক্ষার উপরেই পুত্রের ভবিষ্যতের উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে। যদি তাঁহারা রতি ক্রিয়ার শাস্ত্রীয় উপদেশগুলি যে পুস্তকে বর্ণিত আছে সেইরূপ একখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া অথবা একখানি কাগজে লিখিয়া পুত্রের হস্তে দিয়া বলেন যে, বাবা বধুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহার বিধি নিষেধগুলি লিখিয়া তোমাকে দিলাম; এই বিধি নিষেধগুলি মুনি ঋষিগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তুমি সেই বিধি নিষেধগুলি মানিয়া চলিলে ভবিষ্যতে তোমার মঙ্গল হইবে। সুশ্রী সুবুদ্ধি ও নিরোগী পুত্র কন্যা লাভ করিতে পারিবে, এবং অনেক সাংসারিক জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ, শোক ও মনস্তাপ হইতে রক্ষা পাইবে। সংসার আশ্রম শান্তিময় হইবে, অতএব সেইগুলি মানিয়া চলিবে। এইরূপ করিলে পিতা মাতার দায়ীত্ব শেষ হইল মনে করা অন্যায় হইবে না। নচেৎ পুত্রকে সেই সকল শিক্ষা না দিয়া, অল্প বয়সে তাহার বিবাহ দিবার দায়ীত্ব পিতা মাতার স্কন্ধে চিরকালই থাকিবে।

সংসার আশ্রমের, কেবল সংসার আশ্রমের কেন, সারা জীবনের অধিকাংশ সুখ, দুঃখ কেবল রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। রতিক্রিয়ার বিধিনিষেধ্যে

অনভিজ্ঞ যুবকগণ অল্প বয়সে অতিরিক্ত এবং অযথা শুক্র ক্ষয় করিয়া আপনার রোগ, শোক ও দুঃখ আপনি সৃষ্টি করেন। শাস্ত্রে রতিক্রিয়ার নিয়ম পদ্ধতি সকলই লেখা আছে, কিন্তু কোন্ শাস্ত্রের কোন্ স্থানে সেই সকল লেখা আছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া পাঠ করা যুবকগণের পক্ষে সহজ নয়, সেই কারণে তাহারাও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় না, ফলে যথেচ্ছাচার রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া নানারূপ ক্লেশ ভোগ করে। আজকালকার যুবক যুবতীগণ নভেল নাটক পাঠ করিতে বড় ভাল বাসেন, আর সেগুলিও সহজ প্রাপ্য। শাস্ত্রের উপদেশ সকল সহজ প্রাপ্য না হওয়া বিধায়, তাঁহাদেরও সেই সকল পাঠ করা হয় না। কোন উপাদেয় গল্পের সহিত রতিক্রিয়ার উপদেশগুলি লেখা থাকিলে তাঁহারাও আনন্দের সহিত পাঠ করিতে পারেন এবং পাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন যে এই সকল উপদেশ অনুসারে কাজ করিলে তাঁহারা সুখ শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। রতিক্রিয়ার উপদেশ সমন্বিত একখানি সুপাঠ্য গল্পপুস্তক সহজ প্রাপ্য হইলে, কি যুবা কি প্রৌঢ় সকলেই পাঠ করিয়া সেই সকল উপদেশগুলি জ্ঞাত হইয়া, যাহাতে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া আপনার দুঃখের ভার অনেক লাঘব করিয়া সুখী হইতে পারেন, সেইরূপ একখানি পুস্তক নব বিবাহিত দম্পতীগণের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এই পুস্তকখানি লেখা হইয়াছে। এই পুস্তকে লিখিত উপদেশ মত কার্য্য করিলে তাঁহারা সুশ্রী সুবুদ্ধি সম্পন্ন পুত্র কন্যা লাভ করিয়া যাহাতে দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি ভোগ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন ইহাই আমাদের আন্তরিক অভিপ্রায়।

যাঁহারা অপত্য লাভে বঞ্চিত হইয়া মনকষ্ট পাইতেছেন তাঁহারা শাস্ত্র কথিত উপায় অবলম্বন করিলে অপত্য লাভ করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্র কথিত কৌশল সকল কার্য্যে পরিণত করা সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নয়। যাঁহারা সে সকল বিষয়ে বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের নিকট জ্ঞাত হইয়া চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, নচেৎ প্রায়ই নৈরাশ হইতে হয়।

গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। কেবল দুই একটী মাত্র কথা সংক্ষেপে বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। প্রথম বক্তব্য এই যে, যে কোন বিষয় হউক না কেন, তাহা শিক্ষা না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টের আশা নাই। যেমন ভৈষজ্য বিদ্যা শিক্ষা না করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কেবল অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টের

আশা করা যায় না, তদ্রূপ মৈথুন ক্রিয়াতেও অনেক শিক্ষার বিষয় আছে, শিক্ষা না করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টের আশা করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে শিক্ষা দিবার প্রথা কোন দেশেতেই প্রচলিত নাই। ইহার কারণ, এই বিষয় শিক্ষা দেওয়া লজ্জাকর বোধে শিক্ষা দেওয়া হয় না। কিন্তু এই কার্য্যের বিধি নিষেধগুলি শিক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যকীয়, কারণ এই শিক্ষার উপর মনুষ্যের ভাবী সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি সকলই নির্ভর করিতেছে। সাধু মহাত্মাগণ মৈথুন ক্রিয়ার বিধি নিষেধগুলি শিক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্থির করিয়া মনুষ্যের কল্যাণের জন্য লজ্জাকে উপেক্ষা করিয়া শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যিনি সেই সকল নিয়ম পদ্ধতিগুলি পাঠ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করেন, তিনিই তাহার সুফল লাভ করেন।

পিতা, মাতা, পুত্র কন্যাকে লজ্জাভয়ে যখন সেই সকল বিধি নিষেধগুলি মৌখিক শিক্ষা দিতে অক্ষম, তখন তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার পূর্ব্বে যে পুস্তকে উপদেশ পূর্ণ ও উপাদেয় গল্পের সহিত রতিক্রিয়ার বিধি নিষেধগুলি বর্ণিত আছে, সেইরূপ একখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পাঠ করিতে দেওয়া উচিত। এবং সেই সঙ্গে বলা উচিত যে, বিবাহের পরে তোমরা এই পুস্তকে লিখিত উপদেশ মত কার্য্য করিতে অবহেলা করিও না। এইরূপ করিলে পিতা মাতার আর কোন দোষ হইতে পারে না। কিছুই না করা, বা কিছুই না বলা, দোষের বিষয় বলিয়া মনে হয়।

দেশের আশা ভরসা যুবকদিগকে ও আমাদের কিছু বলিবার আছে। ইয়োরোপের উন্নতির মূল কারণ দৈহিক বল। সেই দৈহিক বলের সহায়ে সেই দেশীয় লোক, সকল প্রকার বিপদ আপদকে অগ্রাহ্য করিয়া অদম্য উৎসাহ এবং অধ্যবসায় সহিত সকল প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং যতদিন সেই কার্য্যে কৃতকার্য্য না হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাহাতে একমনে নিযুক্ত থাকে, এবং এই প্রকারে তাহারা অবশেষে কৃতকার্য্য হয়। আমাদের দৈহিক বলের অভাব, এবং সেই একের অভাবেই সকল প্রকার অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে বল ক্ষয় না হয়, যুবকগণের সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বতোভাবে তাহা করা উচিত। বল সঞ্চয় করিতে হইলে প্রথমতঃ শুক্র ক্ষয় নিবারণ করিতে হইবে। অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া অপরিমিত এবং অযথা শুক্র ক্ষয় হইলে কখনই বল সঞ্চয় হওয়া সম্ভব নয়। দৈহিক বলের

সহায়ে সকল কার্য্যে ব্রতী হইয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া, পরে বিবাহ করিয়া সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, শাস্ত্রানুযায়ী স্ত্রীর সহিত ব্যবহার করিলে আয়ু, আরোগ্য ও সৌভাগ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অবশ্য বর্ত্তমান কালে শক্তি সঞ্চয় করিবার অনেক প্রত্যবায় আছে, কিন্তু সে সমস্ত যে কোন প্রকারে হউক অতিক্রম করিয়া শক্তি সঞ্চয় করা যে প্রধান কার্য্য তাহা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। বর্ত্তমান কালে শিক্ষা প্রণালী নির্দ্দোষ নহে। কিন্তু উপায় নাই। সেই প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে। অর্থ না হইলেও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না, সুতরাং সেইরূপ শিক্ষাই করিতে হইবে। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, এইরূপ শিক্ষা পাইয়া বিদেশীয় আচার ব্যবহার অনুকরণ না করিয়া, পুরাকালের সাধু মহাত্মারা যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, এবং যে সকল উপদেশ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যুবকগণ সেই মহাত্মাগণের পদানুসরণ করিয়া চলিলেই তাঁহারা অশেষ দুঃখরাশী হইতে আপনাদের রক্ষা করিতে পারিবেন। উন্নত-শীল যুবকদিগকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা সাধু মহাত্মাগণের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করুন, তাহাতে পিতা মাতা সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং দেশের মঙ্গল হইবে। পিতা মাতা সন্তুষ্ট থাকিলে সকল দেবতা সন্তুষ্ট থাকিবেন। দেবতারা সন্তুষ্ট হইলে তাঁহারা তোমাদের অভিষ্ট ফল প্রদান করিবেন। তাঁহাদের কৃপায়, আয়ু, আরোগ্য ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিবে, নচেৎ বর্ত্তমানে যেরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে ক্রমেই তাহার বৃদ্ধি হইবে। স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে দাসত্বের শৃঙ্খলে চিরকালই আবদ্ধ থাকিতে হইবে। তর্পণ বিধিতে পিতৃ স্তুতিতে উক্ত আছে—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

এই তো গেল শাস্ত্রের কথা। আমরা একটী কথা বলি সেইটী সকল কথার সার কথা—

পিতা মাতা গুরু আর দম্পতী দেবতা।
সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা এঁরা শুনহ বারতা॥

হে যুবক যুবতীগণ! তোমরা এই সার কথাগুলি কখন ভুলিও না। ইঁহাদের উপর ভক্তি ভালবাসা থাকিলে তোমরা জগতে ধন্য, মান্য এবং গণ্য হইতে পারিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের উপযোগী

কতকগুলি আবশ্যকীয় ও ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

বাধকের ঔষধ—১। পুরাতন সিদ্ধি, বন আদা ও ভেরেণ্ডার কচি পাতা সমভাগে বাটিয়া ৵০ আনা পরিমাণ বটী করিয়া বেদনা কালে সেবন করিলে নিশ্চয় উপসম হয়। ২। রিঠা চূর্ণ /০ আনা, উলট কম্বলের শিকড় ৵০, গোলমরিচ ৪।৫টা জল দিয়া বাটিয়া সেবন করিলে নিশ্চয় বাধক ব্যথা আরোগ্য হয়।

ঋতুদোষের ঔষধ—১। সোহাগার খই, দারুচিনি, কাবাবচিনি, জঙ্গী হরিতকী ও রেণুক সমভাগে লইয়া জবাফুলের রসের সহিত বাটিয়া /০ আনা পরিমাণ বটী করিয়া সেবন করিলে ঋতুদোষ আরোগ্য হয়। ২। দূর্ব্বার মূল, সোঁদালের আটা, গোলমরিচ, পিপুল, শুঠ একত্রে ৵০ আনা পরিমাণ উষ্ণ জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে উক্ত দোষ নিবারণ হয়। ৩। হীরাকষ ১, মুসব্বর ২, জীরা ৩, ও জঙ্গী হরিতকী ৫ ভাগ কাঁটানটের শিকড়ের রসের সহিত বাটিয়া /০ আনা পরিমাণ বটী করিয়া, ডাবের জল গরম করিয়া তাহার সহিত সেবন করিলে রজো বিঘ্ন নিবারণ হয়।

শ্বেত প্রদরের ঔষধ—সোহাগা ৫ কুঁচ হইতে ২০ কুঁচ ১ ছটাক জলে দ্রব করিয়া পিচ্‌কারী দিলে মেহ ও শ্বেত প্রদর শীঘ্র আরোগ্য হয়। ধাই ফুল ৩।৪টা কাঁচা দুগ্ধের সহিত বাটিয়া মধু মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১।২ বার সেবন করিলে আরোগ্য হয়।

রক্ত প্রদরের ঔষধ—ডালিমের ফুল ৩।৪টা কাঁচা দুগ্ধে বাটিয়া মধুর সহিত প্রত্যহ ২বার সেবন করিলে আরোগ্য হয়।

জিহ্বায় ক্ষত—সোহাগার খই মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া জিহ্বায় প্রয়োগ করিলে আরোগ্য হয়। মাত্রা ৫ হইতে ২০ কুঁচ।

স্তনের বোঁট ফাটা—সোহাগার খই ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে সারিয়া যায়।

রজো নিঃসরণ—সোহাগা অল্প মাত্রায় (৫ হইতে ২০ কুঁচ) সেবন করিলে রজো নিঃসরণ হয়।

স্তনে থুম্‌কার ঔষধ—গোলমরিচ, হরিদ্রা পোড়ান ছাই ও হাচ্‌টী পাতা প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণ লইয়া ছাগী দুগ্ধে বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

ঋতু বন্ধ হইয়া তলপেট ভারি হইলে দুই তিন দিন মিছরীর সরবৎ, পাতি লেবুর রস দিয়া পান করিলে রজো নির্গত হইয়া দোষ সারিয়া যায়। এইরূপে ২ সপ্তাহ পান করিলে উক্ত দোষ নিবারণ হইয়া নিয়মিত রূপে ঋতু হয়।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালীন অপরিমিত রক্তস্রাব নিবারণ—দূর্ব্বার রস এক ঝিনুক কাশীর চিনির সহিত সেবন করিলে উক্ত দোষ নিবারণ হয়।

বাধক শূলের ঔষধ—পুরাতন সিদ্ধি, দূর্ব্বার মূল, দারুচিনি প্রত্যেকটী ৫।৬ রতি আর হিং ও কর্পূর ২ রতি ঋতুর পূর্ব্বে বাটিয়া সেবন করিলে উক্ত দোষের শান্তি হয়।

কাণের পুঁজ ও ব্যথার ঔষধ—হিং, কর্পূর ও নিমের পাতা সরিষার তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল ৭।৮ ফোঁটা কাণে দিলে আরোগ্য হয়।

ক্রিমির ঔষধ—ছোট ছেলেদের ক্রিমি হইলে নারিকেলের দুগ্ধ অর্দ্ধ তোলা সমভাগ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া যায়। ১ বৎসরের শিশুকে দিনে ২ বার ও তাহার কম হইলে দিনে ১ বার। আবশ্যক মত এইরূপ ৮।১০ দিন সেবন করাইতে পারা যায়।

দুধতোলা—শিশুদিগের দুধতোলা রোগ হইলে গো দুগ্ধের সহিত স্বচ্ছ চুণের জল পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া ৭।৮ ঝিনুক দুগ্ধে এক ঝিনুক মিশাইয়া সেবন করাইলে আরোগ্য হয়।

প্রস্রাব বন্ধ—বালক ও শিশুদিগের যে কোন কারণে হউক প্রস্রাব বন্ধ হইলে লেবুর রস ও চিনি একত্রে মিশাইয়া নাভিতে মালিশ করিলে প্রস্রাব হয়। নাভিতে নীল বটী জলে ঘষিয়া প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়। পাথর-কুচির পাতা বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়।

শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্য—পানের বোঁটায় রেড়ির তৈল মাখাইয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিলে কোষ্ঠকাঠিন্য সারে। মুক্তঝুরির পাতার নল পাকাইয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিলে শিশুর দাস্ত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য ও তৎসঙ্গে পেট ফাঁপা থাকিলে কালকাসুন্দে পাতার রস ও সরিষার তৈল একত্রে ফেনাইয়া তলপেটে মালিশ করিলেও দাস্ত হয়। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের কোষ্ঠবদ্ধ হইলে জঙ্গী হরিতকী ৵০, বিট লবণ /০ ও মুসব্বর /০ একত্রে আহারান্তে রাত্রে সেবন করিলে প্রাতঃকালে একটী পরিষ্কার দাস্ত হয়। সোনামুখী অর্দ্ধ তোলা, বড় হরিতকী ৪টা, জঙ্গী হরিতকী ৮টা, মৌরী অর্দ্ধ তোলা, মিশ্রী ২ ভরি রাত্রে গরম জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, প্রাতে ছাঁকিয়া পান করিলে ১।২টী দাস্ত হইয়া বায়ু ও পিত্তদোষ নিবারণ হয়।

আমাশয়—বাতাবি লেবুর ১ ঝিনুক রসের সহিত কাশীর চিনি মিশ্রিত করিয়া আহার করিবার সময় সেবন করিলে শীঘ্র সারিয়া যায়। এক ছটাক ঘোলের সহিত চিনি মিশাইয়া আহারের সময় সেবন করিলেও আরোগ্য হয়। গাঁদাল পাতার ঝোল ভাতের সহিত খাইলেও আরোগ্য হয়। গাঁদালপাতা, যোয়ান ও মৌরীর সহিত বাটিয়া বড়া প্রস্তুত করিয়া খাইলেও উপকার হয়।

সমাপ্ত।

অবসর কুসুম ।

সূচীপত্র

বিষয়।

ওঁ

অর্পণ ।

পরম আরাধ্য স্বর্গীয় পিতামাতার শ্রীচরণে প্রগাঢ় ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ অবসর কুসুম উদ্দেশে অর্পণ করিলাম ।

ভাগ্যহীন ।

সন্তান ।

মাতৃবিয়োগ।

পঞ্চম বর্ষের শিশু করি খেলা ধুলা।
ক্ষুধা ছাড়া অন্য কিছু নাহি জানি জ্বালা॥
মায়ের কোলেতে থাকি মায়ের আদরে।
খাইতে দিতেন খাদ্য জননী সাদরে॥
দুঃখ সুখ শোক তাপ নাহি ভাবি মনে।
বেড়াতাম সদানন্দে জননী পিছনে॥
সোহাগে নিতেন বক্ষে করিলে ক্রন্দন।
মুছাতেন আঁখিনীরে করিয়া চুম্বন॥
ভুলাতেন ক্ষুধা ভাবে দিয়ে প্রলোভন।
সাজাতেন চারুসাজে করিয়া যতন॥
তাপিত হইলে তনু নিদাঘ তপনে।
তুষিতেন স্নেহভরে মৃদুল বীজনে॥
নিশীথে শয়ন কালে অতি সযতনে।
বুলাতেন পদ্মপাণি পুত্রের আননে॥
আনিবারে নিদ্রাদেবী সুমধুর স্বরে।
শুনাতেন নানা গীত শ্রবণ বিবরে॥
মাতা ছাড়া অন্য কিছু নাহি ছিল মনে।
সুখ শান্তি সব ছিল মায়ের বচনে॥
অকস্মাৎ কোথা হতে আসিল শমন।
লইতে মায়েরে মোর কালের সদন॥
এড়াইতে তার হাত বহু প্রতিকার।
করিল সকলে মিলি ঔষধি বিস্তর॥
নিঠুর নিদয় কাল না ছাড়িল তাঁরে।
জননী নিলেন শয্যা কাতর অন্তরে॥
শয্যাতে শয়নে হলো বিশীর্ণ শ্রীঅঙ্গ।
থাকিতে নারিল তথা জীবন বিহঙ্গ॥

ফেলিয়া নয়ন নীর চাহি মোর পানে।
উড়ে গেল প্রাণ পাখী কালের ভবনে ॥
অবনী লুটায়ে তনু করিনু মিনতি।
তবু না ছাড়িল কাল মহা দুষ্টমতি ॥
কাঁদিয়া আকুল প্রাণে ডাকিনু মায়েরে।
ফিরে না চাহিল মাতা সুধাতে আমারে ॥
ছিঁড়িল হৃদয়তন্ত্রী জননীর শোকে।
পশিল বিষম বাজ ক্ষুদ্র শিশু বুকে ॥
আছাড়ি পিছাড়ি শোকে দিনু গড়াগড়ি।
মৃত কায়া লয়ে গেল সবে হুড়াহুড়ি ॥
ক্রন্দনে পুরিল পুরী হাহাকার রব।
জীবনের সুখ শান্তি অস্ত হলো সব ॥
মাতৃহীন সেই দিন করিল বিধাতা।
কাঁদিয়া নিলেন কোলে স্নেহময় পিতা ॥
পুরাইতে কেবা পারে মায়ের মমতা।
সেই মাতা ফেলে গেল করিয়া অনাথা ॥
শূন্য মনে ঘুরি ফিরি না পাই সান্ত্বনা।
লুকায়ে কাঁদিয়া নাশি প্রাণের বেদনা ॥
না দেখি মায়ের মুখ কাতর হৃদয়ে।
শূন্য মনে ঘুরিতাম ব্যাকুল হইয়ে ॥
হায় মাতঃ! কোন্ দোষে এত শিশুকালে।
প্রাণের পুতলী তব ফেলিয়া পালালে ?
কোন দোষে দোষী নয় তব শ্রীচরণে,
তবে কেন ফেলে গেলে অবোধ সন্তানে ?
জীবনের শেষ যামে বুঝেছি সকল।
তব দোষ নয় মাগো! মোর কর্ম্মফল ॥
মায়ায় মোহিত আমি অন্ধ জ্ঞানে জ্ঞানী।
হীন বুদ্ধি নর, আমি কি তোমারে জানি ?
জগতের মাতা তুমি জগৎ জননী [illegible]
বিভিন্ন আকারে [illegible] পুনঃ কাহারো রমণী !

তুমি শক্তি মুক্তি দাত্রী পরম প্রকৃতি ।
তোমারে পূজিলে হয় পাপের নিস্কৃতি ॥
বিধি বিষ্ণু যম আদি তোমারে পূজিয়ে ।
অদ্যাপি না পেলে অন্ত খুঁজিয়ে বুঝিয়ে ॥
মোর মাতৃকায়া তুমি ছাড়িয়াছ সত্য ।
প্রকৃতির বেশে কিন্তু দেখি তোমা নিত্য ॥
সুনির্ম্মল তব রূপ চক্ষু অগোচর ।
বাচাতীত জ্যোতির্ম্ময় ব্যাপ্ত চরাচর ॥
ধ্যানে জ্ঞানে গম্য তুমি অগম্য অজ্ঞানে ।
কি করিবে বেদ বিধি পরাস্ত বিজ্ঞানে ॥
দাও মাতঃ! পদছায়া তাপিত তনয়ে ।
দরশন দিও মাগো! অন্তিম শয়নে ॥
কোটী নম করি পায় লইনু বিদায় ।
সঙ্কটে করিও ত্রাণ হইয়া সদয় ॥

প্রার্থনা

তৃষিত তাপিত জনে কেন প্রভু নিরদয় ।
সদয় হইয়ে দেব কর মোর পাপক্ষয় ॥
অজ্ঞানে করেছি পাপ অন্ধ হয়ে দু নয়ন ।
গুরু শাস্তি বিধি নহে সমুচিত কদাচন ॥
তুমি অগতির গতি,
সৃজন পালন স্থিতি,
বিশ্ববীজ বিশ্বরূপ করুণার জলনিধি ।
মোক্ষার্থী অর্থার্থী জীব ডাকে তোমা নিরবধি ॥
যেই ডাকে সেই পায় ডাকিবার মত ডাকে ।
যাহা চায় তাহা পায় নৈরাশ না কেহ থাকে ॥

আগম নিগম বেদ,
পুরাণে না পায় ভেদ,
তোমার বিভূতি তত্ত্ব অসীম অনন্ত তত্ত্ব।
জ্ঞানহীন আমি কিসে বর্ণিব সেই মহত্ত্ব॥
দাও দেব পদছায়া তাপিত নিরত জনে।
জপিতে তোমার নাম যুক্ত করি মনে প্রাণে॥
কত শত মহাপাপী,
উদ্ধারিলে কত তাপী,
অধম সন্তানে প্রভু কর কৃপা বিতরণ।
করিয়া পাপের ক্ষয় কর তারে পরিত্রাণ॥
সংসার-নরক হতে উদ্ধার করহ দীনে।
তুমি বিনা শক্তি কার উদ্ধারিতে পাপী জনে॥
তব পাদপদ্মরেণু,
পুলকে মাখায়ে তনু,
শুদ্ধ হবে মন প্রাণ শুদ্ধ বুদ্ধি কলেবর।
পালাবে যতেক রিপু কাম ক্রোধ বিষধর॥
কলুষ কলঙ্ক যাবে লাভ হবে দিব্য জ্ঞান।
তোমার করুণানীরে করি নিত্য তৃপ্তি স্নান॥
করপুটে নিবেদন,
শুন মোর আবেদন,
জীবনের শেষ দিন পাই যেন দরশন।
তোমাতে অচলা ভক্তি থাকে যেন চিরদিন॥
যমপুরী প্রেতপুরী তাহে নাহি কভু ডরি।
গোলোক বৈকুণ্ঠ পুরী মনে নাহি বাঞ্ছা করি॥
তোমার করুণা ছায়ে,
শীতল করিয়ে কায়ে,
পুলকে করিব গান সুধামাখা তব নাম।
যতদিন থাকি এই পাপে পূর্ণ ভবধাম॥
সুখে দুঃখে সম ভাব ইথে আছে কিবা লাজ।
সম্পদ গৌরব তুচ্ছ তাহে নাহি কোন কাজ॥

সঁপিনু তোমার পায়,
নশ্বর মাটির কায়,
লয়ে চল দীনদাসে তব শান্তি নিকেতনে।
যেথা থাকে সুখে জীব নাহি জানে অহং জ্ঞানে
ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই কামিনী কাঞ্চন নাই।
সুধা পানে মত্ত হয়ে ভ্রমে আনন্দে সদাই॥
জীবনের পরপারে,
গুণহীন নিরাকারে,
মিশিয়া রহিব সুখে যুগে যুগে যুগান্তরে।
জন্ম মৃত্যু পরিহরি কল্পারম্ভে কল্পান্তরে॥
প্রলয় পয়ধি নীরে,
ঘেরে নিলে চরাচরে,
জগৎ প্রপঞ্চ ক্রমে মিশে যাবে পঞ্চ তত্ত্বে।
পঞ্চতত্ত্ব নিরাকারে লয় হবে সব অন্তে॥
নিরাকার এক ব্রহ্ম রবে মাত্র অবশেষ।
আমি তুমি নাহি রবে প্রলয়ের পরিশেষ॥

পিতৃ বিয়োগ।

চতুর্দ্দশ বৎসরে স্নেহময় পিতা।
সরগে গেলেন চলি করিয়া অনাথা॥
অসহায় মাতৃহীন,
হইলাম পিতৃহীন,
অশনি সম্পাতে যেন বিদগ্ধ পরাণ।
বিধাতা সাধিল বাদ হইয়া পাষাণ॥
গৃহপানে দেখি চেয়ে,
শূন্য মনে ভয়ে ভয়ে,
না হেরি পিতারে তথা ব্যাকুল হইয়ে।
ঘুরি ফিরি যেথা সেথা ব্যথিত হৃদয়ে॥

হায় বিধি নিদারুণ,
কি দোষে হলে বিগুণ !
অবোধ সন্তান প্রতি শৈশব জীবনে।
অপরাধী কভু নহে তব শ্রীচরণে ॥
পুত্রের কর্ত্তব্য যাহা,
পালন করিতে তাহা,
অবসর নাহি দিলে করিতে সমাধা।
অজ্ঞানে আবৃত জ্ঞান হলো না সুবিধা ॥
জননী পরাৎপর,
জনক সারাৎসার,
তাঁদের আশিসে হয় সকলি মঙ্গল।
তাঁদের করুণা বিনা জীবন বিফল ॥
পুরুষ প্রকৃতি উক্তি,
একাধারে দুই শক্তি,
দুয়ের সংযোগে প্রাণ হয় উৎপত্তি।
প্রাণ কর্ম্ম স্থির হ'লে প্রাণেতে নিবৃত্তি ॥
কেবা বুঝে এই তত্ত্ব,
সমস্যা বিষম শক্ত,
গুরু ব্রহ্ম কৃপাবলে কুঠস্থ দর্শন।
তথায় পেয়েছি সব নিগূঢ় সন্ধান ॥
পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম,
পিতৃ সেবা পুণ্য কর্ম্ম,
বঞ্চিত হইনু তাহে বিধির বিধান।
মম দোষ নহে পিতঃ ললাট লিখন ॥
পিতা মাতা একাধারে,
নমি আমি যুগ্ম করে,
নশ্বর মাটীর কায় যদিও অদৃশ্য।
তথাপি সর্ব্বত্র দেখি উভয়ে প্রকাশ্য ॥
অবোধ তনয় পিতঃ,
শৈশবে বঞ্চিত মাতঃ,

কৃপানেত্রে দেখো তারে বিপদে আপদে।
কৃপার ভিখারী তব না চাহি সম্পদে॥
সম্পদ বন্ধের হেতু,
তব কৃপা স্বর্গ সেতু,
বঞ্চিত কোরো না তাহে ভিখারী সন্তানে।
পাই যেন সেই কৃপা জীবনে মরণে॥

মুক্তি পদ।

আইল গোধূলি সতী পশ্চিম গগণে।
কল ধৌত বর্ণ ছটা ছড়ায়ে ভুবনে॥
ত্যজিবারে তনু ভানু ডুবিল সাগরে।
ঘেরিল মেদিনী জুড়ে বিষম আঁধারে॥
বিকশিত অরবিন্দ মকরন্দে ভরা।
মুদিল কুরঙ্গ আঁখি শোকে হয়ে সারা॥
মদমত্ত মধুব্রত হয়ে হত আশা।
গুঞ্জরিয়া রোষ ভরে চলে গেল বাসা॥
অবসর পেয়ে বিধু উদিল পুরবে।
ফুটিল কুমুদবালা গৌরবে গরবে॥
কুহু কণ্ঠ কুহু স্বরে করিল কল্লোল।
মলয়ের মধুবায়ে ছুটিল হিল্লোল॥
কল কণ্ঠ বক্র কণ্ঠে ভাসিছে সরসে।
কৌমুদী মাখিয়ে গায় ডাকিছে হরষে॥
তারানাথ সহচর তারকার দল।
আসিয়া তরঙ্গে বসি হাসে খলখল॥
ভয়েতে খদ্যোত কুল পালাইল দূরে।
চঞ্চল কটাক্ষে চাহে বসিয়া আঁধারে॥
পেচক কীচক প্রায় কর্কশে ডাকিয়া।
কোটর ছাড়িল খাদ্য খাইতে খুঁজিয়া॥

শিবাকুল শব আশে ছুটিল শ্মশানে।
দেখে সবে শব সব আবৃত বসনে॥
কুকুরে করিল তাড়া এক সঙ্গে জুটে।
বিকৃত বুলিতে পুচ্ছ উচ্চ করি ছুটে॥
প্রকৃতির নানা রঙ্গ দেখিয়া গোধুলি।
লুকাল মেঘের আড়ে হইয়া ব্যাকুলী॥
রজনী সজনি ধনি এলো ত্বরা করি।
যুবা যুনী শয্যা লয় ভুজ পাশে ধরি॥
যুবতী বদন ইন্দু কামের আলয়।
মাতিল ত্বরিত তাহে সানন্দে উভয়॥
রঙ্গরসে রসালাপে যাপিল যামিনী।
কুহু কণ্ঠ কোলে করি এলো উষারাণী॥
তরাসে তাকায়ে বিধু লুকাল জলদে।
কাঁদিল কুমুদবালা বিরহ বিষাদে॥
তরুণ তপন পরে উঠিল বিমানে।
হাসিল নলিনী সতী সরসী সদনে॥
তপনে তাপিত ক্রমে জগতের প্রাণ।
মলয় মরুতে মাগে দিতে পরিত্রাণ॥
এক আসে এক যায় জগতের রীতি।
শিখিয়া না শিখে কেহ প্রকৃতির নীতি॥
যৌবন বার্দ্ধক্য জরা আসে পরে পরে।
পাঁচেতে মিশায় কায়া মৃত্যু নাম ধ'রে॥
চিরস্থায়ী নহে কিছু প্রপঞ্চ জগতে।
মোহিত যতেক জীব মায়ার মোহতে॥
মৃত্যুঞ্জয় হতে চাও কাল সূত্র ধর।
কালের সহায়ে কাল হেলে জয় কর॥
ধরিয়া সুষুম্না পথ চক্রে যাও ধীরে।
দেখিবে কালের ঘর আছে তব শিরে॥
আদি বীজমন্ত্র ইষু করিয়ে সন্ধান।
আঘাত করহ ঘারে হয়ে সাবধান॥

মুক্ত হবে রুদ্ধ যার জ্যোতির প্রকাশ।
শান্তি নিকেতন সেই কালের আবাস॥
জরা মৃত্যু নাই তথা জ্যোতির্ম্ময় দেশ।
বদ্ধ জীব মুক্ত হয় করিলে প্রবেশ॥
দেহধারী জীবে তথা প্রবেশ নিষেধ।
দেহ ছাড়ি দেহী যায় হইয়া প্রভেদ॥
মুক্তি পদ একে বলে শুনহ সন্ধান।
ফিরে নাহি আসে জীব গেলে সেই স্থান

ক্রমশঃ